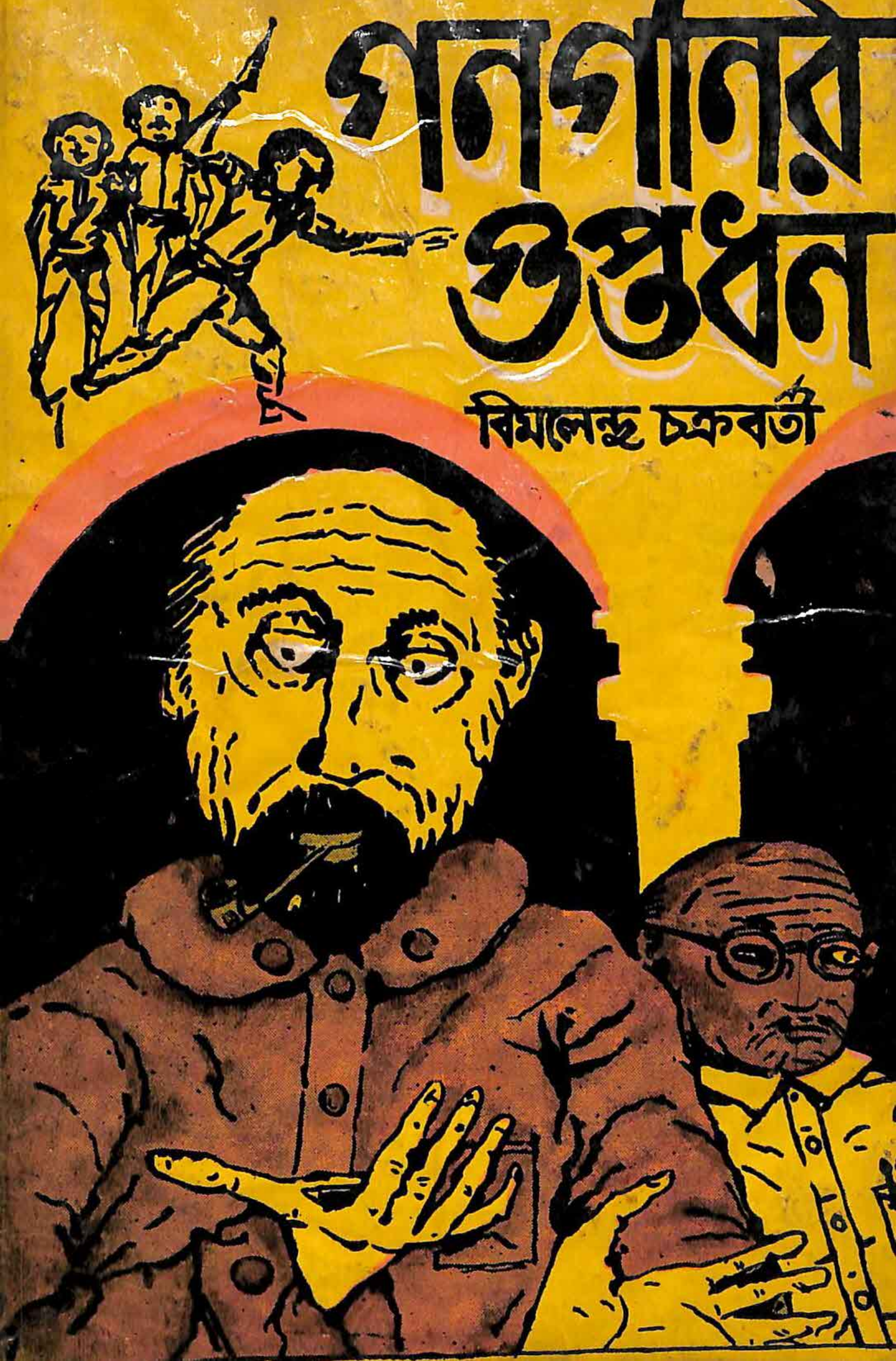
গনগনির গুপ্তধন

বিমলেন্দু চক্রবর্তী



গনগনির গুপ্তধন

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

অণিমা প্রকাশনী

১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর
অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৭৯১৩

প্রথম প্রকাশ : জন্মাষ্টমী, ২রা ভাদ্র, ১৩৯১/১৯শে আগষ্ট, ১৯৮৪

মুদ্রক : শ্রীদুলাল চন্দ্র ঘোষ
নিউ লোকনাথ প্রেস
৮এ, কাশী বোস লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট ও ছবি :
বিমলেন্দু চক্রবর্তী

মূল্য : আট টাকা

স্থাপত্য-শিল্পী

গোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম সুহৃদবরেষু

লেখকের অন্যান্য রচনা :

মধ্যদিনের গান

রহস্যময় মহেনজোদড়ো

মহাসংগম

শুশুনিয়ার রহস্য

রহস্যময় আগন্তুক

প্রতিবিম্ব

সোপান

বাঘবন্দী

সাক্ষাৎকারে ভৈরবী সাধিকা

অজন্তার কথা

ভারতের গুহাচিত্র

১

সরু চাপা গলি। দু' পাশে মাটির বাড়ি। একের পর এক মাটির ঘর। মাথায় বিচালীর চাল। মাটির দেওয়ালে লেপ্টে আছে খোলামকুচি। একখানা দু'খানা নয়—হাজার হাজার খোলামকুচি। কোনটা লাল কোনটা কালো। ফ্যাকাসে কালো রঙের খোলামকুচিও আছে।

এক দেওয়ালে পোতা আধখানা কলসীর কানা। পটলমামার চোখে পড়তেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। চশমার ফাঁক দিয়ে বাঁকা চোখে দেখলেন। দাঁড়ালেন না। রাস্তা এখানে বাঁক খেয়েছে। একটা সরু রাস্তা নীচের দিকে নেমে গেছে। গলি-পথ আরো সরু। গলির মুখের সামনে একটা লাল বাক্স। পোষ্ট অফিস থেকে ঝুলিয়ে রেখেছে চিঠিপত্র ফেলার জন্যে।

পটলমামার পাশ থেকে এঙলিঙ নীচের রাস্তায় নেমে গেলেন। ঝটপট কয়েক ধাপ এগিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। দেওয়ালের গায় নিকষ কালো বড় একখানা খোলামকুচি। মাটির ভিতর থেকে দাঁত বের করে যেন হাসছে।

পটলমামা নামলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখ দুটি শুধু এগিয়ে গেল। তাকিয়ে আছেন দূরের মজা পুকুরের দিকে। কি যেন ভাবছেন।

এঙলিঙ বললেন, "ইউ থি....ইউ থি...."

পটলমামা দেখলেন। তাঁর কপালের চামড়ায় কয়েকটা ভাঁজ খেলে গেল। নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন, "কাম ব্যাক।"

এঙলিঙ ঘুরে দাঁড়ালেন। আবার হাঁটতে শুরু করলেন। গলি বেয়ে রাস্তায় উঠে এসে পটলমামার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। দু'জনে নীরব

চোখে কি যেন বললেন। তারপর হাঁটা শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে এলেন শাস্ত্রী পল্লীর শেষ প্রান্তে। সেখানেই দুর্ঘটনা ঘটলো।

গলির মধ্য থেকে হঠাৎ একটা সাইকেল এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো দু' জনের উপর। আর একটু হলে এঙলিঙ চাপা পড়ে যেতেন। চাপা পড়লেন না। হঠাৎ সাইকেল হুড়মুড় করে কাঁধের উপর পড়তেই লাফ মারলেন। ছিট্‌কে পড়লেন পটলমামার গায়ের উপর। দু'জনেই পড়ে গেলেন। পটলমামার মুখ থেকে পাইপ ছিট্‌কে পড়লো রাস্তায়।

যুবকটি পা নামিয়ে নিজেকে সামলে নিল। চোখ বুলিয়ে দেখে নিল দু'জনকে। তারপরই সাইকেল চালিয়ে দিল। পটলমামার পাইপের উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে গেল।

পটলমামা উঠে গায়ের ধুলো ঝেড়ে নিলেন। এঙলিঙ চোখের চশমা নাকে ঠিক মত লাগিয়ে ঝোলা কাঁধে তুলে নিলেন। ততক্ষণে পটলমামা পা বাড়িয়েছেন। এঙলিঙ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর পিছনে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁদের দেখে মনে হল না এই মুহূর্তে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

কয়েক পা এগোতেই শাস্ত্রী পল্লীর শেষ বাড়ি এসে গেল। মাটির দোতালা ঘর। সামনে উঠোন। উঠোনে বকুল গাছ। গাছের গোড়া সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। উল্টো দিকে বাউরী পাড়া। বাড়ির শেষ প্রান্তে কয়েকটি গাছ। বাঁয়ে উঁচু ঢিপি। ঢিপির উপর তালগাছ। তালগাছের পিছনে খাদ। খাদের পরেই চড়াই। চড়াইতে কয়েকখানা ছোট ঘর। বাউরীরা থাকে।

দু' পা এগোতেই রাস্তার পাশে আতা গাছের নীচে হাজার হাজার ঘোড়া। ঘোড়া নয় ঘোড়ার মৃত দেহ। একের উপর আর একটা ঘোড়া মুখ থুবরে পড়ে আছে। কোন ঘোড়ার মাথা স্কন্ধচ্যুত। কোন ঘোড়ার পা ভাঙ্গা। কোন ঘোড়া চিৎ হয়ে আছে। ঠ্যাং চারটে আকাশের দিকে তুলে ধরা। রাস্তার পাশে এমন হাজার হাজার ঘোড়া দেখলে চমকে উঠতে হয়।

পটলমামা চমকালেন না। ঘোড়ার সমাধির সামনে থমকে দাঁড়ালেন। পিছনে এসে দাঁড়ালেন এঙলিঙ। এ যেন এক যুদ্ধ ক্ষেত্র। লড়াই শেষ হয়েছে। সৈন্যরা সব ফিরে গেছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে পড়ে আছে হাজার হাজার নিহত

ঘোড়া। কালো আর লাল ঘোড়া। বর্ষার জল পেয়ে স্যাঁতলা জমে গেছে।

এঙলিঙ অস্পষ্ট গলায় বললেন, "ইউ থি।"

পটলমামা বললেন, "গোরাই গাজীর কবর। এগুলো মানতের ঘোড়া।"

এঙলিঙ চোখ তুললেন। দেখতে পেলেন আতা গাছের জটলার মধ্যে ইটে গাঁথা কবর। ইটগুলি দাঁত বের করে আছে। মানুষ প্রমাণ উঁচু কবরটি। ছাদ নেই। সামনের দিকে নীচু দরজা। দরজার দু' পাশে সামান্য নকৃশা। মাঝখানে সমাধি। সমাধির উপর গাছের শুকনো পাতা। কতদিন ঝাঁটা পড়ে নি যেন। ধূপকাঠী জ্বলে না আর। সন্ধ্যা হলে প্রদীপ জ্বালাতে আসে না কোন ভক্ত নারী। পরিত্যক্ত গোরাই গাজী মাটির নীচে তাঁর সব বিশ্বাস আর কর্মফল নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন।



এঙলিঙ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর পিছনে হাঁটতে শুরু করলেন···

পটলমামা আবার অস্ফুট গলায় বললেন, "গোরাই গাজীর কবর।"

এঙলিঙ পটলমামার মুখে চোখ ফেললেন। পটলমামা কি বলছেন তা বুঝতে পারছেন না। এঙলিঙ গোরাই গাজীর নাম শোনেন নি।

পটলমামা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। গাঢ় স্বরে বললেন, "কিছুই থাকে না। মহাকাল সব গ্রাস করে। যুগোত্তীর্ণ নায়ক বিস্মৃত হয়ে যায়। জঙ্গল এসে কবর দখল করে।"

এঙলিঙ মাথা কাত করে পটলমামার কথাগুলি শুনলেন। তাঁর ছোট চোখ দুটি আরও ছোট হয়ে গেল। পিট্-পিট্ করে খানিক সময় দেখলেন কবর। পাশেই জঙ্গলা গাছে ফুটে আছে হলুদ রঙের ছোট ছোট ফুল। বুনো ফুল। তার কয়েকটি তুলে কবরের উপর সাজিয়ে দিলেন। পটলমামা পকেটে হাত ঢুকিয়ে পাইপটা খুঁজলেন। পাইপ পেলেন না। শূন্য হাত পকেট থেকে তুলে আনলেন। চোখ তুললেন আকাশে। আকাশ অনাবৃত নীলে নীল। নীল সমুদ্রের মত। সেই নীল সমুদ্রে সাদা মেঘ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। নীলের পিছনে নীল, তার পিছনে আছে মানুষের অজানা অচেনা অজ্ঞাত এক দেশ। মৃত্যুর পরের কুহেলিকাময় সেই দেশ।

২

সামনেই দেখা গেল শীলাবতী নদী। এখান থেকে শুধু বালির এক দীর্ঘ রেখা। তার পরেই সবুজ মাঠ। সবুজ গাছের জটলা। তার ছায়ায় ছায়ায় গ্রাম আর মানুষের নিত্য দিন যাপনের সংসার।

এপারে শুধু ঢেউয়ের পর ঢেউ। নদীর ঢেউ নয়। মাটির ঢিপি। একের পর এক মাটির ঢিপি। নদীর ঢেউ যেন কার মন্ত্রে মাটি পাথরে পরিণত হয়ে স্থির হয়ে আছে।

ঢিপির মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা পথ। পটলমামার পিছনে এঙলিঙ। দু'পাশে মাটির ঢিপি। ঢিপির উপর অসংখ্য খোলামকুচি। কোন এক

খেয়ালী মানুষ যেন কয়েক হাজার হাড়ি-কলসী এখানে ভেঙে গুড়ো-গুড়ো করেছে। কবে, কোন্ সময়ে? উত্তর নেই। আকাশে সূর্য। তার রোদ ঢিপির উপর। লাল-কালো খোলামকুচি আর কাঁকড়। কোন কোন কাঁকর কালো। পটলমামা ঝুঁকে একটি তুলে নিলেন। বেশ ভারী। হয়তো পাথরের মধ্যে লোহা। তিনি পাথরের টুকরোটি এঙলিঙের হাতে দিলেন।

এঙলিঙ পাথরের টুকরো নাকের কাছে এনে দেখলেন। টপ্ করে পাথর আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। পাথর খণ্ড ফিরে আসতেই খপ করে লুফে নিলেন। আবার ভাল করে দেখলেন। পাথরটা পাশের জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

ততক্ষণে পটলমামা অনেকটা নীচে নেমে গেছেন। এখান থেকে রাস্তা নীচু হয়ে খাদ কেটে শীলাবতীতে গিয়ে মিশেছে। যত নীচে নামা যায় তত বড় খাদ চোখে পড়ে। দু'পাশে পাথর আর কাঁকড়ের তাল দোতালা বাড়ীর মত উঁচু। উপরের দিক কালো। নীচের দিক টকটকে লাল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাদ। শাল গাছের চারা। তাদের আঁকাবাঁকা শিকড় সাপের মত পাক খেয়ে ঝুলে আছে।

পটলমামা থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর ডান দিকে কাঁকড়মাটির গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কয়েকটি খোলামকুচি। তিনি চোখ উপর দিকে তুল-লেন। আঁকা-বাঁকা শালের শিকড় আর কাঁকড়ের শক্ত দেওয়াল। এমন শক্ত মনে হয় পাথরের খোয়া ফেলে কে যেন দুরমুজ করে রেখেছে।

" ইউ থি....ইউ থি" শুনে পটলমামা ফিরে তাকালেন। তাঁর কয়েক হাত দূরে এঙলিঙ। পিছন দিকে পিঠ ঝুঁকিয়ে ঢিপির উপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। কুতকুতে ছোট চোখ দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত। নাকটা ফুলে আছে। চশমা নীচে নেমে এসে নাকের ডগায় ঝুলছে।

পটলমামা দ্রুত এগিয়ে এলেন। এসে যা দেখলেন তা বিস্মিত হবার মতই। পাহাড়ের ফুট দুয়েক নীচে লাল মাটির স্তর। সেই স্তরে পর পর সাজানো আছে একের পর এক ভাঙ্গা হাড়ি-কলসীর টুকরো। তাদের গায়ের রং ধুসর কালো।

এ কি কোন শ্মশান? দেখে তাই মনে হয়। খোলামকুচির অনেক অংশ

বাইরে বেরিয়ে আছে। তার উপরে রোদ পড়েছে। ঝক্-ঝক্ করছে হায়েনার দাঁতের মত। কারো পিঠ পেলেই ছুবলে রক্ত বের করে নেবে।

শ্মশান আর একটু দূরে। তাই পটলমামা দাঁড়ালেন না।

ঢালু পথ এগিয়ে শীলাবতীর বালিতে হুমরী খেয়ে পড়েছে। পথের ডান পাশে শ্মশান। শ্মশানের পাশ থেকে নদীর রেখার মত বৃহৎ খাদ। দু'পাশে খাড়াই পাহাড়। বালি ভেঙে চলতে হয়। দু'পাশের পাহাড়ের গায়ে নানা রকম নক্শা। ছোট ছোট খাদ। কোথাও পাথর এগিয়ে এসেছে। রোদ পড়েছে। পাশেই দীর্ঘ ছায়া। এ যেন ঘুমন্ত রাজপুরী। একের পর এক প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। জানালা দরজা সব আছে। হাঁ করে খোলা আছে। কিন্তু কোন প্রাণী নেই। নিস্তব্ধ। দুপুরের রোদে ঝিম মেরে আছে। হয়তো এককালে প্রাণ ছিল, প্রাণী ছিল, ছিল সবুজ মায়া। এখন কিছু নেই। ক্ষত বুক হাঁ করে খুলে রেখে রোদের মধ্যে হা-হা করছে।

পটলমামা শ্মশান পার হয়ে নীচে নামলেন না। দাঁড়ালেন সবুজ বাগানের সামনে। শ্মশানের বাঁয়ে উঁচু ঢিপি। ঢিপির চারিদিকে কাঠি পুঁতে বেড়া দেওয়া। মাঝখানে অনেক গাছ, গাছের পর গাছ। সবুজ পাতা, পাতার ফাঁকে ফুল। রুক্ষ লাল ঢিপির মাঝখানে যেন জীবনের সবুজ উজ্জ্বলতা।

৩

দরজা খোলাই ছিল। পর পর ইট সাজিয়ে সিড়ি তৈরী। সিঁড়ির মাথায় বিচালীর চালের ছোট মাটির ঘর। পটলমামা উপরে ওঠা শুরু করলেন। উপরে উঠতেই খানিকটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উঠোন। আরো দু'খানা মাটির ঘর। মাঝখানের ঘরে কালীর মূর্তি। কালো কালী নয়, নীল কালী। শ্মশান কালী সাধারণত নীল হয়ে থাকে।

পাশের ছোট ঘর থেকে ছ্যাক্ ছ্যাক্ আওয়াজ আসছে। একটু একটু ধোঁয়াও বাইরে এসে গাছের পাতা বেয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ওটি

রান্না ঘর। মাছ ভাজার শব্দ আসছে তা এঙলিঙ বুঝতে পারলেন। তাঁর নোলায় জল এসে গেল। অন্যমনস্ক হতে গিয়ে কালীর মূর্তি দেখতে পেলেন। অমনি বলে উঠলেন, "ইউ থি, মাডাল খালি।" হাঁটু ভেঙে বসে ভক্তি সহকারে প্রণাম করলেন।

পটলমামা প্রণাম করলেন না। একটা দড়ির খাটিয়া পাতা ছিল। গিয়ে তার উপর জাঁকিয়ে বসলেন। পিঠের থলে খুলে একটা পাইপ বের করলেন। তামাক পুরে আগুন লাগিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে তাকালেন। মাথার ওপর দেখতে পেলেন আকাশমণি গাছ। কুচি-কুচি হলুদ ফুল ফুটে আছে। হাওয়ায় ডালপালা দোল খাচ্ছে। অমনি ঝাঁকে-ঝাঁকে আকাশমণি ফুল ঝরে পড়ছে। হলুদ রংয়ের যেন বৃষ্টি নামছে।

এঙলিঙ দু'-একবার রান্না ঘরের দিকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে এসে বসলেন পটলমামার পাশে। কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে বললেন, "টান ট্রিক ভৈলব ইন খিচেন লুম।" কথাটা বলে পটলমামার মুখে চোখ ফেললেন। পটলমামার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন।

খড়মের আওয়াজ শুনে চোখ খুললেন। দেখতে পেলেন দীর্ঘকায় এক পুরুষকে। গায়ের রং ফর্সা। চিবুকের নীচে কাঁচা-পাকা দাঁড়ি, মাথায় জটা নেই, আছে কাঁধ পর্যন্ত চুল। কপালে রক্ততিলক নেই দেখে এঙলিঙ হতাশ হলেন।

খড়ম বাজিয়ে সামনে এসে সাধুজী জিগ্যেস করলেন, "আপনারা?"

পটলমামা যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। বললেন, "আপনি একজন প্রাক্তন বিপ্লবী। দেশমাতৃকা ছেড়ে কালীমাতায় এলেন কেন?"

সাধুজী একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, "আপনি যা শুনেছেন তা সত্যই শুনেছেন। তবে মায়ের মূর্তি কেন তা বলতে পারবো না। কার্যকারণ সূত্রে অনেক ওলট-পালট ঘটনা জীবনে ঘটে। ঘটে না-কি?" পটলমামার চোখে চোখ ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন।

পটলমামা বললেল, "হ্যাঁ, এ রকম ঘটে। এই দেখুন না আমাকে, এক সময় ছিলাম আবগারী দারোগা। এখন চাকরি ছেড়ে বাউণ্ডুলের মত ঘুরে মরছি।"

সাধুজী বললেন, "চাকরি ছেড়ে দিলেন!"

পটলমামা বললেন, "হ্যাঁ। পাগলামী বলতে পারেন। তবে এ রকম পাগলামীও কোন কোন মানুষ করে।"

পটলমামা আবগারী দারোগা ছিলেন শুনে এঙলিঙ খিক্ খিক্ করে হেসে উঠলেন। পটলমামা ফিরে তাকাতেই অপ্রস্তুত হয়ে হাসি থামালেন। পটলমামা ডাহা মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছিলেন বলেই এঙলিঙের হাসি পেয়েছিল।

সাধুজী এঙলিঙকে দেখে একটু বিস্মিত হলেন। বললেন, "ইনি?"

পটলমামা বললেন, "মিঃ এঙলিঙ। তিব্বতী দার্শনিক।"

এঙলিঙ মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে ফিক্ করে একটু হেসে দিলেন। বললেন, "ইউ থিত দাউন।"

সাধুজী ভাঙ্গা চেয়ারটায় চেপে বসলেন। বসে দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে কাঁচা-পাকা দাঁড়িকে পরিপাটি করে বললেন, "আপনার নামটি জানতে পারি? আমার নাম সুকুমার রায়। এই গড়বেতারই মানুষ।"

পটলমামা ঘরের মধ্যে কালীমূর্তির দিকে একবার তাকালেন। চোখ ফিরিয়ে এনে বললেন, "হারাধন চক্রবর্তী।"

পটলমামা নিজের নাম 'হারাধন চক্রবর্তী' বলতেই এঙলিঙ ফিক্ করে হাসতে গিয়ে পটলমামার চোখে চোখ পড়তেই হাসি আটকে ফেললেন।

সাধুজী নাম শুনে সামান্য একটু হাসলেন। পটলমামা সে হাসি দেখতে পেলেন বলে লজ্জা পেলেন। হাসি সামলে লজ্জিতভাবে বললেন, "ডাক-সাইটে আবগারী দারোগার নাম হারাধন। যে ধন হারিয়ে গেছে তাইতো হারাধন।"

তিনজনে একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

হাসি থামতেই পটলমামা ঝট্ করে উঠে পড়লেন। দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন সাইকেলটিকে। সেই পথের যুবকটি সাইকেল নিয়ে নীচের উৎরাইতে দাঁড়িয়ে আছে। পটলমামাকে দেখতে পেয়েই ঝট্ করে সরে গেল। সাইকেল চালিয়ে ঢিপির আড়ালে চলে গেল।

৪

একগাল ধোঁয়া উদ্‌গার করতে করতে পটলমামা ফিরে এসে খাটিয়ায় বসলেন। তাঁর কপালের চিন্তার রেখা অন্য দু'জনে লক্ষ্য করলেন না। পটলমামা বসেই বললেন, "এবার বলুন। শুনতে চাই দেশমাতৃকা থেকে আপনার কালীমাতায় আসার গল্প।"

সাধুজী একটু কাশলেন। কাশি থামিয়ে বললেন, "তেমন করে বলার মত কিছু নেই। আপনি দারোগা মানুষ, বোলচাল দিয়ে লাভ নেই। বিপ্লবী দলে ভিড়েছিলাম সেটা এমন কিছু নয়। দেশ স্বাধীন হবার পর করার আর কিছু রইল না।"

সাধুজী থামলেন। খড়মে খট্ খট্ আওয়াজ তুলে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। এক গ্লাস জল খেয়ে বিড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। নিজের আসনে বসে একটা বিড়ি নিজের মুখে গুঁজলেন। অন্য বিড়িটি এগিয়ে ধরলেন এণ্ডলিণ্ডের দিকে।

এণ্ডলিণ্ড হাত বাড়িয়ে বিড়ি নিলেন। ঠোঁটের মাঝখানে বিড়ি গুঁজে ঘাড় একটু কাত করে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ।" মুখটি এগিয়ে ধরলেন সামনের দিকে। বিড়ি ধরিয়ে দিক তাই বোধ হয় চেয়েছিলেন।

বিড়ি ধরিয়ে দিলেন সাধুজী। নিজেরটাও ধরালেন। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "ভেবেছিলাম দেশের কাজ করবো। আমাদের ডাকা হল না। দেশ সংগ্রামীরা ক্ষমতায় এসে যে ভাবে লুটে নিতে থাকলেন তাতে আমাদের মত মানুষদের ডাক পড়ার কথাও নয়। দেখতে দেখতে স্বদেশীরা চড়-চড় করে বড়লোক হয়ে গেলেন।"

আবার থামলেন। বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে বললেন, "ভাবলাম গ্রামে ফিরে কিছু কাজ করবো। ফিরে এসে দেখি, চারিদিকের লুঠপাট দেখে তাদের চরিত্রও পাল্টে গেছে। করার কিছু নেই। তা মশায় বনের

মোষ তাড়ানো যাদের অভ্যাস তারা চুপ-চাপ থাকতে পারে কি ?"

পটলমামা পাইপ কামড়ে ধরে বললেন, "তাই এই ছায়া সুনিবিড় আশ্রয়টি গড়ে তুললেন।"

সাধুজী মাথা নাড়লেন। বললেন, "অত সহজে একটা মানুষ পাল্টায় না। গ্রামের ছেলেগুলোকে গড়ে তোলার কথা ভাবলাম। তাদের নিয়েই গড়ে তুলেছিলাম এই ছায়া সুনিবিড়...." কথাটা শেষ করলেন না। একটু থেমে সখেদে বললেন, "সবাই একে একে পালিয়ে গেল।"

পটলমামা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, "দেশের কথা কারো মাথায় আর আসে না। দেশ তলিয়ে যাচ্ছে সর্বনাশের দিকে। দেশ চোর-বাট্‌পাড়ের দেশে পরিণত হবে তা কখনো ভাবি নি।"

সাধুজী বললেন, "আমরা প্রাণ দিতে এগিয়েছিলাম কতগুলি অসাধু মানুষকে বড়লোক করতে!"

পটলমামা আবার ঝট্‌ করে উঠে দাঁড়ালেন। দু' পা এগোতেই দেখতে পেলেন মানুষের মাথা। ঝপ্‌ করে ঝোপ-ঝাপের আড়ালে চলে গেল।

সাধুজী অবাক হয়ে বললেন, "কি হল ?"

পটলমামা ফিরে এসে আবার বসলেন খাটিয়ায়। বললেন, "এখান থেকে নদী দেখতে কিন্তু দারুণ লাগছে। আপনার পোঁতা গাছগুলি সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁক থেকে দেখা যায় নদীর জল। মনে হচ্ছে যেন রূপোর পাতের টুকরো গাছপালার মাঝখানে পাতা আছে।"

সাধুজী একটু হাসলেন।

সাধুজী বললেন, "আপনারা নতুন লোক, কোথায় উঠেছেন ?"

পটলমামা স্পষ্ট জবাব দিলেন না। নিজের আসল নাম যে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী কোথাও তা বলেন না। খ্যাতি অনেক বিড়ম্বনার কারণ হয়ে ওঠে। তাই বললেন, "জায়গাটি ভালোই লাগছে।"

সাধুজী গলায় শব্দ করলেন, "অ—।" বললেন, "সে গড়বেতা আর নেই। নিত্য নতুন খুনোখুনি,—আর ভালো লাগে না।"

পটলমামা স্থির চোখে সাধুজীকে দেখলেন। বললেন, "দেশ, দেশের মানুষকে না জেনে না বুঝে কোন বিপ্লবই সফল হয় না।"

সাধুজীর ভুরু টান-টান হয়ে গেল। বললেন, "ছেলেগুলো বিপথগামী।"

পটলমামা একটু হাসলেন। বললেন, "মত ও পথ নিয়ে বিরোধ থাকতে পারে, থাকেও। কিন্তু সবার আগে জানা চাই এই বিচিত্র দেশের বিচিত্র মানুষগুলিকে। না জেনে না বুঝে এগোলে কি হয়?"

পটলমামা প্রশ্ন করে তাকিয়ে রইলেন।

এঙলিঙ বুড়ো আঙুল তুলে সাধুজীর মুখের সামনে নাড়িয়ে দিলেন।

সাধুজী অস্ফুট গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কচু?"

আলোচনা বন্ধ হ'ল।

৫

দুটি গাঁয়ের লোক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। আদুল গা। গায়ের রং কালো। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত খারে কাঁচা কাপড়ে ঢাকা। মাথার চুলে চক্‌চকে তেল। গালে খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি। বুকের খাঁচা অনেকটাই অনাবৃত। চোয়াল ঠেলে ওঠা। চোখ দুটি কপালের খাঁজের মধ্যে ঢুকে আছে। গ্রামের দু'জন দরিদ্র চাষী। পা ভেজা দেখে বোঝা যায় শিলাবতী পার হয়ে এসেছে। গড়বেতার সর্বমঙ্গলার মন্দিরে যাবে।

তারা উপরে এসে মা কালীর সামনে গড় হয়ে প্রণাম করলো। একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

সাধুজী পটলমামার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাদের কাছে মিথ্যে কথা বলবো না। বিশেষ করে মিঃ এঙলিঙ যখন আছেন। এখানে কালীমূর্তি আছে বলে দু'চারজন মানুষ আসেন। আমি একা থাকলে এদিকে কোন লোক পা ফেলতো না। এখানকার লোকেরা দেশের কথা শুনতে চায় না। আমি অন্য কিছু জানি না যে বলতে পারি।"

পটলমামা বললেন, "আপনি সত্য কথাই বলছেন। মানুষ ভয়ানক আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। এই বাঙালী 'সবার উপর মানুষ সত্য' ধর্ম বলে

মানতো তা ভাবাই যায় না।"

সাধুজী একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। দু'বার বিড়িতে টান দিয়ে বললেন, "লোক দুটি নদীর ওপারে থাকে। ওরা ভিখ্‌নগর থেকে এসেছে।"

ভিখ্‌নগর শুনেই এণ্ডলিও চমকে উঠলেন। বললেন, "হোয়াত্‌?"

সাধুজী বললেন, "ভিখ্‌নগর।" কথাটা বলেই ভাবলেন হয়তো এণ্ডলিও তাঁর কথা বুঝতে পারলেন না। বললেন, "নদীর ওপারে ভিখ্‌নগর বলে একটা গ্রাম আছে। পঞ্চ পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসে এসে ঐ গ্রামটিতেই প্রথম ভিক্ষা করেছিলেন। তাই গ্রামের নাম ভিখ্‌নগর।"

পটলমামা মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন, "সঙ্গে কে ছিল? সাক্ষী রেখে অজ্ঞাত জীবনে ভিক্ষে তো করে নি পাণ্ডবরা। তবে সবাই জানলো কি ভাবে?"

সাধুজী বললেন, "তাতো জানি না। এ ভাবে ভাবি নি।"

পটলমামা একটু হাসলেন। বললেন, "ভাববার কথা নয়। গল্প গল্পই। এমনি কত গল্প বাঙলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে আছে।"

সাধুজী বললেন, "এসব তো ঐতিহাসিক সত্য।"

পটলমামা বললেন, "না। এগুলো গল্প। বাঙালীর মনে রামায়ণ মহাভারতের কোন কোন নায়কের বিশেষ প্রভাব আছে। খোল্‌সা করে বললে বলতে হয় কিছু আদর্শবাদী ও ক্ষমতাবান্‌ মানুষকে বাঙালী ভালোবাসে। তাদের নাম, স্মৃতি নানা ভাবে ব্যবহার করে খুশি হতে চায়। এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।"

সাধুজী বললেন, "মহাভারতে আছে ভীমের বঙ্গ বিজয়...." কথাটা শেষ করলেন না। তাঁকে একটু বিভ্রান্ত মনে হল।

পটলমামা বললেন, "ভীম এবং রঘু 'বঙ্গদেশ' বিজয় করেছিল তা রামায়ণ মহাভারতে বলা আছে। অনেকে মনে করেন গঙ্গাই ছিল ভারতীয় বণিকদের একমাত্র যাতায়াতের পথ। তাই উত্তর ভারতীয় বণিকদের সুবিধার জন্য রঘুকে হয়তো বঙ্গ জয় করতে হয়েছিল। তাই বলে শীলাবতী নদীর তীরে পাণ্ডবরা প্রথম ভিক্ষে করবে—তার স্মৃতি রক্ষা করতে ভিখ্‌নগর বলে গ্রামের নাম হবে তা হতে পারে না।" পটলমামা এক নিঃশ্বাসে এতগুলি

কথা বলে থামলেন।

সাধুজী আরো বিভ্রান্ত হয়ে গাল চুলকোতে থাকলেন। কোন কথা বলতে পারলেন না।

পটলমামা আবার নিজেই হয়তো কথা শুরু করতেন। কিন্তু তার আগেই এগুলিঙ মুখ খুললেন। বললেন, "ইউ থি, নগল। আই মিন ভিখ্ নগল, এ থিতি।"

পটলমামা বললেন, "নগর শব্দ যখন নামের সঙ্গে তখন ধরে নিতেই হবে এক সময় নগর ছিল। তবে সে নগর আজকের নগর নয়। আর বাংলা-দেশে বড় নগর কোন কালেই ছিল না। পাকা ইটের বাড়ীর সংখ্যা যে কোন সময়েই ব্যাপক হয়েছিল তা হয় নি। হয়তো ছোট কোন বৌদ্ধ নগরের স্মৃতি নামের পিছনে আছে।"

সাধুজী চমকে উঠে বললেন, "বৌদ্ধ নগর।"

পটলমামা ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। বাঙালী এক সময় ব্যাপক হারে বৌদ্ধ হয়েছিল। তাম্রলিপ্ত ছিল এক সময় বিখ্যাত বন্দর। যতগুলি স্থলপথ ছিল তার একটা ছিল গড়বেতার কাছাকাছি দিয়ে। তাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লাভ করা অস্বাভাবিক নয়।"

সাধুজী বললেন, "তাই বলে ভিখ্নগর ?"

পটলমামা বললেন, "হ্যাঁ।" পকেট হাতড়ে দিয়াশলাই বের করলেন। নিভে যাওয়া পাইপ ধরিয়ে বললেন,"বৌদ্ধরা দু'রকম। একদল ছিল ভিখারী বৌদ্ধ, অন্য দল গার্হস্থ্য বৌদ্ধ। তারা ভিক্ষে করতো না। ভিক্ষু বৌদ্ধরা সংঘরাম তৈরী করে এক জায়গায় বাস করতো। তারা সঞ্চয় করতে পারতো না। প্রতিদিন নিজের যতটুকু দরকার ততটুকু ভিক্ষে করতো। ফিরে এসে ধ্যান, অধ্যায়ন নিয়ে থাকতো। তারা গ্রাম-গ্রামান্তরে গিয়ে মানুষকে সদাচার শিক্ষা দিত। তাই জনসাধারণ আদর করে তাদের বসতে দিত।"

পটলমামা থামলেন। পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে বললেন, "ভিক্ষে সহজলভ্য হলে অনেক অলস লোক ভিখারী হয়ে যায়। আবার উৎসাহী একদল বেশি সংখ্যক ভিক্ষু এক জায়গায় থাকলে তাদের কেন্দ্র করে একটা জমজমাট জনপদ গড়ে উঠতে পারে। বেশি লোক ভিক্ষে করে বলে ভিখ্

গাঁও, ভিখ্ গ্রাম, ভিখ্ নগর হতে পারে। আবার নগরের সব থেকে প্রভাবশালী মানুষটি বৌদ্ধ শীল নিয়ে সব দান করে দিয়ে ভিক্ষুক হল। এতো হতে পারে?"

পটলমামা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন সাধুজীর দিকে।

সাধুজী ঘাড় কাত করে জানিয়ে দিলেন তা হতে পারে।

পটলমামা বললেন, "বৌদ্ধ যুগে অনেক বিত্তশালী লোক ভিক্ষু হয়ে যে সব সম্পত্তি সংঘকে দান করে দিয়েছে তার অনেক কাহিনী আছে। তেমন কোন ঘটনার স্মৃতি অক্ষয় করার জন্য ভিখ্ নগর নাম হতে পারে।"

সাধুজী বিড়ি টানতে ভুলে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে বিড়ি খসে পড়ে গেল। শুধু বললেন, "আশ্চর্য।"

৬

প্রসঙ্গ হয়তো আরো এগোত। কিন্তু এগোল না। হঠাৎ পটলমামা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "পরে কথা হবে।" ঝড়ের বেগে সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে নামতে থাকলেন। এঙলিঙ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর তিনিও পটলমামার পিছু পিছু নেমে এলেন। সাধুজী বিহ্বল হয়ে বসে রইলেন চেয়ারে। তিনি কিছু বুঝতেই পারছেন না যেন।

পটলমামা সোজা চলে এলেন শ্মশান পার হয়ে শীলাবতী নদীর তীরে। থমকে দাঁড়ালেন। কোন মানুষ দেখতে পেলেন না। সোজা জলের মধ্যে নামলেন। জুতো পর্যন্ত খুললেন না। ওপারের বালিতে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে রইলেন।

এঙলিঙ কোনরকমে জল পাড়ি দিয়ে বালি ঠেলে এসে পটলমামার সামনে দাঁড়ালেন। গড়বেতার দিকে চোখ যেতেই বিহ্বল হয়ে পড়লেন। সারি দিয়ে চলেছে ঢিপি। নদী সোজা তার খাদ নামিয়ে দিয়েছে। লাল মাটি দেখা যাচ্ছে। রুক্ষ, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। নদীর তীর এমন হৃদয়হীন

লাল রঙের রুক্ষ স্বভাবের হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

হঠাৎ পটলমামা এঙলিঙকে ধাক্কা মারলেন। তিনি পড়ে গেল বালির উপর। কি যেন সাঁ করে চলে গেল তাঁর কানের পাশ দিয়ে। তীরের ফলার মত এক পোঁচে বাতাসের বুক চিঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

এঙলিঙ কিছু বুঝতে পারার আগেই পটলমামা তাঁকে টেনে তুললেন। টানতে টানতে নিয়ে গেলেন গাছের আড়ালে। পাশেই কয়েকটা বাঁশ পোঁতা। একটা ডোঙ্গা। চাষী এই ডোঙ্গায় করে শীলাবতীর জল তুলে ক্ষেতে দেয়। পাশেই ধান ক্ষেত। তার পাশেই পথ। পটলমামা তাঁকে টেনে নিয়ে ধান ক্ষেতের পথ ধরলেন।

এঙলিঙ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "হোয়াত! হোয়াত!"

পটলমামা বললেন, "নাথিং।"



পটলমামা মাটির ওপর পড়ে থাকা গুলিটাকে তুলে নিলেন····

এঙলিঙের চোখ দুটি পিট্ পিট্ করা শুরু করলো। কিছু হয় নি তা বিশ্বাস করতে পারছেন না। কি ঘটলো তা বুঝতেও পারলেন না।

পটলমামা ঝুঁকে মাটির উপর পড়ে থাকা গুলিটাকে তুলে নিলেন। আপন মনে বললেন, "এরা কারা? আমাদের পিছনে কেন?"

এঙলিঙ পটলমামার হাতে গুলি দেখে চমকে উঠলেন। বললেন, 'হোয়াত?'

পটলমামা দু' আঙুলের মধ্যে গুলিটিকে ধরে এঙলিঙকে দেখালেন।

এঙলিঙ চোখ বিস্ফারিত করে দেখলেন। তাঁর কপালের রেখাগুলি কিলবিলিয়ে উঠে স্থির হল। মুখটা অস্বাভাবিক লাল দেখালো। চিবুকের নীচের দু'গাছা চুল থর থর করে কাঁপতে লাগলো। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "এতেম্‌ত্ তু মার্দাল।"

পটলমামা বললেন, "না, মেরে ফেলতে চায় নি। মানুষ মারার অনেক ঝঞ্ঝাট। ওরা বোধহয় ভয় দেখাতে চায়। কিন্তু কেন তা বুঝতে পারছি না।"

৭

ধানের ক্ষেত পার হতেই গ্রাম। শীলাবতীর এদিকে পাথর নেই। উঁচু-নীচু টিপি নেই। নেই বুক চেরা খাড়ি। লাল কাঁকর মাটি নয়। নরম মাটি। গাছ-গাছালির সারি। মাঝে মাঝে পুকুর। খেজুর আর তাল গাছ। কাজুবাদামের গাছও আছে। পুকুরে গাছের গুড়ি ফেলে ঘাট তৈরী। তার পাশেই চালা ঘর। আতা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। আতা গাছে টিয়া পাখী।

পটলমামা হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে একখানা ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। মাটির ছোট ঘর। মাথায় বিচালীর চাল। দরজার দু'পাশে সাদা রং দিয়ে যত্ন করে ছবি আঁকা। নদীর লহরের মত লম্বা লতা চলেছে। লতার ভাঁজে ভাঁজে সাদা ফুল। দরজার মাঝখানে মন্দিরের ছবি। দু'পাশে পাখী। মেয়েদের হাতের কাজ। সহজ সরল কিন্তু স্নিগ্ধ। ঘরের দিকে

তাকালে প্রাণ জুড়িয়ে যাবার কথা।

উঠোনে পা দিতেই বৃদ্ধ চাষী উঠে এল। একপাশে বসে কাঠ চির-ছিল। হাঁটুর উপর ময়লা কাপড়। মুখে বসন্তের দাগ। তার উপর কাঁচা-পাকা দাঁড়ি। চোখে ক্লান্তি। হাত জোড় করে এসে দাঁড়ালো সামনে। বললো, "বাবু...."

লোকটি প্যাণ্ট-সার্ট পরা লোক দেখে ঘাবড়ে গেছে যে তা পটলমামা বুঝতে পারলেন। বললেন, "আমরা সরকারের লোক নই। তোমাদের গ্রাম দেখতে এসেছি।"

লোকটি অবাক হয়ে বললো, "গাঁ দেখার কি রয়েছে বাবু। হেথায় মানুষ থাকে নি।"

পটলমামা একটু হাসলেন। বললেন, "তোমরা কি মানুষ নও?"

লোকটি বললো, "আমরা বাউরী বাবু।" এমন ভাবে কথাটা বললো যে মনে হল বাউরীরা মানুষ নয়।

এঙলিঙ তার কথা শুনে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাসলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, "বাকৃলী অল্সো ম্যান। বিগ ম্যান। ইউ নো হিথ্রি।"

হিস্ট্রিকে তিনি হিথ্রি বলে উচ্চারণ করলেন। অবশ্য হিস্ট্রী বললেও লোকটি বুঝতে পারতো না। সে দেশ ও তার নিজের জাতির ইতিহাস জানে না, খোঁজও রাখে না।

পটলমামা বললেন, "বাউরীরা খুব বড় জাত। তোমরা ভুলে গেছ তোমাদের পরিচয়।"

লোকটি বিনয়ে অবনত হল। বললো, "বাবুরা বসবেন নি।"

এঙলিঙ বললেন, "থিওর বথবো। থিন্টি মিন্টি...."

লোকটি এঙলিঙের বিচিত্র ভাষার অর্থ বুঝতে পারলো না। কিন্তু লোক দুটি বসতে রাজী তা বুঝতে পারলো। একটা খাটিয়া পেতে দিল।

পটলমামা খাটিয়ায় জাঁকিয়ে বসলেন। তখন তাঁকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে খানিক আগে তাঁর প্রাণ সংশয় হয়েছিল।

পটলমামা উঠে দাঁড়ালেন। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে বাড়ীর শেষ প্রান্তে দাঁড়ালেন। পাইপ টানতে টানতে কি যেন ভাবছেন। এঙলিঙ সেই

সুযোগে লোকটির সঙ্গে আলাপ করা শুরু করলেন। বললেন, "থুমি একজন বাক্‌লী আছো, খুব ভালো আছো।"

লোকটি তার ভুল সংশোধন করে দিল। বললো, "বাবু, আমরা বাক্‌লী লয়, বাউরী।"

"দ্যাত্‌থ্‌ লাইত্‌," এঙলিঙ বললেন, "বাক্‌লী খুব ভালো জাত আছে। মেডিনীপুল, ঘলবেতায় এতো এতো ঘটনা ঘটাইয়াছে। আই নো, বাক্‌লী খুব জোয়ান আছে। লথে পালে। ইউ নো তুয়াল?"

লোকটি আবার তাঁর ভুল সংশোধন করার জন্য বললো, "বাবু, আমরা বাউরী। ঘলবেতা লয় গড়বেতা।"

এঙলিঙ বললেন, "নো-নো। ছোট জাত কেনো হোবে? বাক্‌লী খুব বলো জাতি আছে। ইউ নো তুয়াল?"

'তুয়াল' কি তা বুঝতে পারলো না লোকটি। হাঁ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

এঙলিঙ তখন দেখতে পেল লোকটির ছেলেকে। বারান্দায় এসে হাঁ করে বাপের মতই তাকিয়ে আছে। নিজের চোখ দুটিকে বিশ্বাস করবে কিনা বুঝতে পারছে না। এমন বিচিত্র মানুষ এর আগে সে দেখে নি। এঙলিঙের মাথায় চুল নেই। মাথার শেষ প্রান্তে কানের পাশে কয়েকগাছা লাল চুল আছে। রোদ পরে চুল ক'গাছা চক্‌-চক্‌ করছে। ভুরুতে ও গোঁফে চুল নেই। গায়ের রং ফর্সা। চোখ দুটি ছোট। ছোট চোখ দুটির উপর নিকেলের চশমা। নাকটি থ্যাবরা। নাকের শেষ প্রান্তে কয়েকগাছা লাল চুল লম্বা হয়ে ঝুলে আছে।

তিনি লোকটিকে ছেড়ে ছেলেটিকে নিয়ে পড়লেন। বললেন, "আই খকা, খেলা হবে। আয়—যাদু খেলা হবে, আ...."

ছেলেটি ভয় পেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

তিনি চটে গেলেন। বললেন, "ভয়! হাউ ফানি। বাক্‌লীলা খাওয়ার্দ! মিথিরিয়াত!" একখানা হাত উপরে তুলে তিনি তাঁর হতাশা আর আফশোষ প্রকাশ করলেন।

পটলমামা শুনতে পেলেন। এসে আবার বসলেন।

লোকটি বিনয়ের সঙ্গে বললো, "উনি আমাদের বাক্‌লী বলছেন। আমরা বাক্‌লী লয় বাউরী।"

পটলমামা হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, "উনি তিব্বতের মানুষ। তাই বাংলা উচ্চারণ ঠিকমত করতে পারেন না।"

লোকটি অবাক হয়ে বললো, "তিব্বত?"

পটলমামা বললেন, "তিব্বতের নাম শোন নি?"

লোকটি বললো, "সেটি কোথায় আছেন?"

পটলমামা হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন। এঙলিঙের মুখের উপর চোখ রেখে বললেন, "দুর্ভাগ্য মিঃ এঙলিঙ! বাঙ্গালী তিব্বতের নাম ভুলে



নো-নো। ছোট জাত কেনো হোবে?....

গেছে।" পটলমামার গলা বিষণ্ণতায় ডুবে গেল।

এঙলিঙের চোখ দুটি পিট্ পিট্ করতে লাগলো। ঠোঁট দুটি কাঁপছে। ঠোঁটের সঙ্গে কাঁপছে চিবুকের শেষ প্রান্তে ঝুলে থাকা লাল চুল ক'গাছা।

পটলমামা অসহায় হয়ে মাথা নাড়লেন। বললেন, "বাঙ্গালী তিব্বতকে জানে না। অথচ এক সময় তিব্বত থেকে বহু ছাত্র আসতো বাংলা দেশে বিদ্যা শিক্ষা নিতে। বাঙ্গালী পণ্ডিতরা তিব্বতে চলে যেতেন শিক্ষক হয়ে। শিল্পকলার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কতরকম বিনিময় হত। তিব্বতের গ্রন্থাগার থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে কত লুপ্ত পুঁথি। তিব্বতী দার্শনিক তারানাথ নাম লিখে না রাখলে হয়তো আজকেও আমরা জানতে পারতাম না শিল্পের গৌড়ীয় আঙ্গিকের কথা। ধীমান বীতপালের মত শিল্পীরা অজ্ঞাত থেকে যেত।"

পটলমামার গলা ভারী হয়ে এল। মুখে নেমে এল বিষণ্ণ কালিমা। খাটিয়ার উপর বসলেন। নীরবে পাইপ টানতে থাকলেন।

পটলমামা খানিক সময় আপন মনে পাইপ টেনে নিজের মনেই বলতে লাগলেন,

"আগে চলে বার ঘণ্টা পতাকা নিশান
ছাব্বিশ হাজার ঘোড়া চলে কানে কান ॥
সাজিল প্রধান ঢালি বুড়া কুম্ভকার...."

পটলমামা তাঁর আওড়ানো কবিতা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই এঙলিঙ হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠলেন। সামনের দিকে ঝুঁকে হাতে তালি দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সুর করে বললেন,

"আঘ দোম বাঘ দোম ঘোলা দোম থাজে।
ধাল মঘর ঘাঘন ভাজে...."

পটলমামা তাঁকে থামালেন। থামিয়ে তাঁর বলা ছড়াটি আবার নিজে বললেন। ছড়াটি এঙলিঙের ভয়ানক প্রিয়। তবে উচ্চারণের দোষে শ্রোতারা বুঝতে পারে না। তাই পটলমামা শুরু করতেই হাতে তালি দিয়ে তাল রাখা শুরু করলেন।

"আগে ডোম বাগে ডোম ঘোড়া ডোম সাজে
দাল মেঘর ঘাঘর বাজে...."

ছড়া বলতে বলতে থামলেন। তাঁর মুখ ভয়ানক গম্ভীর মনে হল। গাঢ় গলায় বললেন, "বাংলার ধীবর, বাউরী, ডোম, সাঁওতাল এরাই হল ভূমিজ সন্তান। এদের অতীতের ইতিহাস উজ্জ্বল। অনেক কীর্তি আর সংগ্রামের ইতিহাস আছে যা বলবার মত, শোনবার মত। নানা রাষ্ট্রবিপ্লব উত্থান-পতনের পথে সে সব ইতিহাস লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন এরা পরাজিত, অবহেলিত। অথচ এরাই ছিল বাংলার ইতিহাসের নায়ক, সভ্যতার স্রষ্টা।"

বৃদ্ধ চাষীটি এত সময় নীরবে পটলমামার কথা শুনছিল। এবার হাত জোর করে বললো, "আমরা ছোটনোক। ন্যাকাপড়া শিখা হয় নি।"

পটলমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, "কে বলে তোমরা ছোট মানুষ ? তোমরাই মানুষ। মানুষের জন্য মানুষের যে কল্পিত দেশ তোমরাই তার নায়ক। আদর্শ মানুষের আচরণ এখনও তোমরাই বাঁচিয়ে রেখেছো। মানুষকে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারার জন্য গৌতম বুদ্ধ পাঁচ পাঁচটি শীল দিয়েছিলেন। সে পাঁচটি শীলের আচরণ তোমাদের মধ্যেই বেঁচে আছে।..."

"....আর আমরা ?" পটলমামা একটু থামলেন। পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "আমরা মানুষের চেহারায় অমানুষ। দেশ এক শ্রেণী চতুর লোকের অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র। ঠগ, জোচ্চোর, ভ্রষ্টচারীরা এখন সমাজের নায়ক। এমন সুন্দর দেশ এই বাংলা মনুষ্যত্বের শ্মশানে পরিণত।"

পটলমামার চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে এল। তিনি কেঁদে ফেলবার ভয়ে থামলেন।

৮

নদীর পরেই শ্মশান। শ্মশানের গা থেকে শুরু হয়েছে খাড়ি। কয়েক পা এগিয়ে গেলে খাড়ি গভীর হয়ে ওঠে। দু'পাশে পাহাড়ের মত উঁচু পাড়। দেওয়ালে হাজার হাজার ফাটল। কোথাও দেওয়াল মসৃণ করে চাঁছা। পাশেই ছোট ছোট খাড়ি। খাড়ি পাক খেয়ে খানিকটা গিয়ে থেমে গেছে।

এঙলিঙ বাঁ পাশের খাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছেন দেখে পটলমামা দাঁড়ালেন। মাথার উপর সূর্য। রোদ খাড়া ত্রিশূলের মত নেমে আসছে। পায়ের নীচে পাথর। কোথাও কোথাও বালি।

এঙলিঙ সামান্য একটু এগিয়ে ফিরে এলেন। পটলমামা বললেন, "বড় খাড়িটা ধরে চলুন। এ খাড়িটা বাউরী পাড়ার পাশ দিয়ে পাক খেয়ে গিয়ে উঠেছে ওলাই-চণ্ডীর থানে। তারপরে গড়খাই। এ খাড়িটা দিয়ে এগোলে বাউরী পাড়ার পিছনটা দেখতে পাব।"

এঙলিঙ বললেন, "এ্যাদ ইউ লাইখ।" মাথাটা ঝাঁকিয়ে হাঁটা শুরু করলেন। তাঁর পিছনে পটলমামা। রোদের তাত প্রখর। জায়গাটা নিষ্ঠুর। কে যেন রেগে-মেগে পাথরের বুক চিঁড়ে ফালি-ফালি করে দিয়েছে। তবুও গনগনির খোলের মত গনগনে নয়।

পটলমামার চোখের উপর ভেসে উঠলো গনগনির খোল। একের পর এক খাড়ি। খাড়ি থেকে বেড়িয়েছে আবার খাড়ি। সে খাড়িরও অনেক শাখা-প্রশাখা। সবুজের চিহ্ন নেই। কোন মানুষ আসে না গনগনির খোলে। পাখীও উড়ে আসে না। শ্মশানের মত নিস্তব্ধ। প্রাণ হীন। যুগ যুগ ধরে গনগনি যেন ভৈরবের মত ধূনি জ্বালিয়ে কার অপেক্ষায় বসে আছে।

খাড়ির শেষ প্রান্তে শীলাবতী নদী। তীব্র স্রোত নিয়ে জল বালি কাঁকর টেনে নিয়ে চলেছে। সেই জল নদীর উপর সবুজ শ্যামল। অথচ তার বিন্দুমাত্র করুণা গ্রহণ করে নি গনগনি। সে যেন আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে বসে থাকতেই ভালোবাসে।

এঙলিঙ বললেন, "মিথিরিয়াত ল্যান্দ। নো লাইফ। দাথ লাইখ মলুভূমি। দল নেই, ঘাত নেই, কলুনা নেই।" হাত নেড়ে বললেন, "ভালোবাতা নেই। থুহু থতান-থতান।"

পটলমামা বললেন, "শ্মশানই বটে। কত মানুষ এখানে প্রাণ দিয়েছে তার কোন হিসাব আছে?"

বিস্মিত এঙলিঙ ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ ছুটি বিস্ফারিত। বললেন, "নেখলে মানুত ধলে নিয়েছে। খুন। আই মিন হান্তিং প্লেথ?"

পটলমামা মাথা নাড়িয়ে বললেন, "নো, নো। নেকড়ের হাতে আর কটা

মানুষ মরেছে। তার থেকে ঢের বেশি মানুষ মেরেছে মানুষরূপী নেকড়েরা। এক সময় গনগনির খোলে হাজার হাজার ইংরেজ সেপাই বন্দুক নিয়ে লাফিয়ে পড়েছে। হাজার হাজার গুলি ছুড়েছে। হাজার হাজার মানুষ লুটিয়ে পড়েছে গনগনির খোলে। রক্ত নদীর স্রোতের মত খাড়ির পথ বেয়ে নেমে গেছে। তবু গনগনির তৃষ্ণা মেটে নি। দেখছেন, একটা ঘাস পর্যন্ত গজায় না।"

এঙলিঙ থমকে দাঁড়ালেন। চোখ থেকে চশমাটা টেনে নামিয়ে হাতে ধরলেন। রোদের তাতে মুখ লাল। বললেন, "হোয়াত? হাদাল হাদাল মানুত মোলে গেলো!"

পটলমামা বললেন, "তাই হয়েছিল এখানে। আপনি চূয়াড় বিদ্রোহের কথা শুনেছেন?"

এঙলিঙ বললেন, "তুয়াল!"

পটলমামা তাঁর উচ্চারণ ঠিক করে দেবার জন্য বললেন, "চূয়াড়। চূয়াড় বিদ্রোহ।"

এঙলিঙ তাকিয়ে রইলেন বিহ্বল চোখে।

পটলমামা বললেন, "ইংরেজ আমলে মেদিনীপুরের আদিবাসীরা গণ-বিদ্রোহ করেছিল। তাদের ঘাটি ছিল এই গনগনির খোল। এখান থেকে তারা লড়াই করেছে ইংরেজদের গোলাবারুদের বিরুদ্ধে। এ বিদ্রোহে লায়েক, চূয়াড়, পাইক সবাই ছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা গণ-হত্যার সাফাই গাইতে নাম দিয়েছে 'অসভ্য চূয়াড় বিদ্রোহ'।"

পটলমামা থামলেন। খাড়া পাথরের পাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনের পাতায় ভীড় করে এল কতো ইতিহাস।

গড়বেতা বগড়ী পরগণার অংশ। বগড়ী বা বকদ্বীপ থেকেই বাগ্‌দী নাম এসেছে। এখানে কোন রাজা ছিল না। আরণ্যক বাগ্‌দী অন্যান্য আদিবাসীরা মিলিত হয়ে সর্দার নির্বাচন করতো। তাকে বলা হত 'মণ্ডল'। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল। মণ্ডল তাদের মত নিয়ে রাজ্য শাসন করতো।

চারিদিকে ছিল গভীর শাল বন। মাঝে মাঝে ভূমিজ মানুষের বসতি। চাষ করে ফসল ফলাতো। বন থেকে শিকার করে আনতো।

মেয়েরা ফল-মূল সংগ্রহ করতো। এমনি করে তারা শান্তিতে বাস করতো।

কিন্তু শান্তিতে কোন মানব গোষ্ঠীই বুঝি বাস করতে পারে না। একদল চালাক লোক বাইরে থেকে আসে। কখনো গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই ক্রমে শক্তিশালী হয়ে রাজা হয়ে বসে। তার পরেই শুরু হয় লুটপাট। যুদ্ধ এসে হানা দেয় শান্ত সুখী জীবনে।

পটলমামা এসব কথা ভাবছিলেন আর হাঁটছিলেন। কিন্তু হঠাৎ চমকে সরে গেলেন, একটা পাথরের নুড়ি এসে পড়লো পায়ের উপর। তিনি পাথরটি হাতে তুলে নিলেন। কালো কিন্তু ঝামার মত নানা ছেদা। ওজন আছে। তিনি উপর দিকে তাকালেন। আরো কয়েকটি ঢেলা ঝড়ে পড়লো।

পটলমামা এক লাফে এঙলিঙের কাছে চলে গেলেন। তাঁর হাত ধরে দ্রুত দেওয়ালের কাছে সরে এলেন। পাথরের আড়ালে আড়ালে চলতে শুরু করলেন। দু'পা গিয়েই একটা পাথরের ফাটল দেখতে পেলেন। ফাটলের মধ্যে কাত হয়ে একটা মানুষ ঢুকে যেতে পারে। এঙলিঙকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলেন। পরে নিজে ঢুকলেন।

ঢুকে বুঝতে পারলেন পাথরের বুকের ফাটল নয়। এ এক খাড়ি। সাপের মত এঁকে-বেঁকে অনেক দূরে চলে গেছে। দু'জনে এগোতে লাগলেন। অনেকখানি এগিয়ে পেলেন বাটীর মত একটা ফাঁকা জায়গা। দু'তিনজন বেশ আরাম করে বসা যায়। মাটিতে লাল কাঁকর। উপরে এগিয়ে আছে খানিকটা ছাদ। সারা জীবন বসে থাকলেও কারো পক্ষে টের পাওয়া সম্ভব নয়।

পটলমামাকে বসতে দেখে এঙলিঙ বসলেন।

৯

পটলমামার অনুমান যে নির্ভুল তা দু'তিন মিনিট বাদেই বোঝা গেল। পাথরের গায়ে কান লাগিয়ে বুঝতে পারলেন উপরে মানুষ। মানুষ কয়টির

পায়ের চাপেই পাথর খসে পড়েছিল।

হঠাৎ সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তখন পটলমামা দেখতে পেলেন মানুষের কঙ্কালটিকে। কঙ্কাল ঠিক নয়, একখানা হাত। লাল কাঁকড়ের মধ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে আছে। কোন মানুষের কঙ্কাল কাঁকর বালির নীচে চাপা পড়ে হাতখানা যেন বাইরে বের করে রেখেছে মুক্তির আশায়। মুক্তি সে পায় নি। হাতের মাংস কবে পচে খসে গেছে। কঙ্কালটার পাঞ্জাটুকু বিবর্ণ রং নিয়ে জেগে আছে।

পটলমামা বুঝতে পারলেন কোন এক হতভাগ্য পুরুষের কবরের উপর বসে আছেন। লোকটিকে খুন করে এখানে কবর দিয়ে রেখে গেছে। তাড়াতাড়িতে হাতখানা চাপা দিতে ভুলে গেছে।

তাতে খুনীদের কোন অসুবিধা হয় নি। দশ-বারো বছরে এখানে কোন মানুষ এসে ঢোকে নি। ঢোকার কথাও নয়। কোন মানুষের চোখে পড়ে থাকলে সে ভয় পেয়েছে। ভয় পেয়ে আর কোন মানুষকে বলে নি।

পটলমামা এঙলিঙকে দেখালেন। এঙলিঙ কঙ্কালের হাত দেখে অস্ফুট গলায় বললেন, "মাই গদ্।" একটু সরে বসলেন।

উপর থেকে মানুষের গলার আওয়াজ শোনা গেল। ফস্ করে কে যেন দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বাললো। তারপর শোনা গেল তাদের কথা। কিছু বোঝা গেল না। অনুমান করতে পারলেন কোন বিষয় নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে।

পটলমামা পাইপটা নিভিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এঙলিঙ পাথরে হেলান দিয়ে দিবা নিদ্রা দিলেন। একটু বাদেই তাঁর নাকের ফস্‌-ফস্ আওয়াজ শুরু হল।

বসে থেকে থেকে পটলমামারও ঝিমুনি এসে যাচ্ছিলো। কিন্তু ঘুমোতে হল না। তার আগেই ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ শুনতে পেলেন। তারপর দ্রুত ছোটা পায়ের শব্দ। শব্দ শ্মশানের দিকে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

মানুষ দেখে বাউরীদের শুয়োর ঘোঁত ঘোঁত করে পালিয়েছে তা পটলমামা বুঝতে পারলেন। এঙলিঙকে নিয়ে বাইরে এলেন। বাইরে বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক দেখলেন।

পায়ের কাছে বালিতে দেখতে পেলেন শুয়োরের পায়ের ছাপ। তার

পিছনে পিছনে চলেছে জুতোর ছাপ। পটলমামা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। পাইপ ধরিয়ে হাঁটা শুরু করলেন।

খানিকটা এগিয়েই খাড়ি বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে যেতেই দেখতে পেলেন একটা শুয়োরকে। শুয়োর তাঁদের আগেই দেখেছে। নাক দিয়ে বাতাস শুঁকে হুড়-মুড় করে উল্টো দিকে দৌড় লাগালো। শুয়োরের দৌড় দেখে এঙলিঙ ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হেসে উঠলেন।

খাড়ি এখানে চওড়া। বুকের মধ্যে হুমড়ী খেয়ে পড়ে আছে পাথরের চাঁই। খাড়ি ভর্তি বালি। দু'পাশে খাড়াই পাথরের গায় ছোট ছোট দু'একটা শাল গাছ। কারো কারো লম্বা শিকড় সাপের মতো আঁকা-বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে। একটা পাথরের ফাঁকে কাশ গাছ। ফুল শুকিয়ে আছে। পটলমামার এই শুকনো ফুলের চিহ্ন বড় ভালো লাগলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন কাছে গিয়ে দেখবেন বলে। কিন্তু কাছে যাওয়া হল না। থমকে দাঁড়াতে হল।

এঙলিঙ বললেন, "ইউ থি····ইউ থি।" তাঁর গলায় উত্তেজনা।

আঙ্গুল লক্ষ করে খাড়াই দেওয়ালের দিকে চোখ তুললেন পটলমামা। উপরে চোখ যেতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেলেন।

খাড়া দেওয়ালের উপর আকাশ। আকাশ নীল। নীল চাঁদোয়া টানিয়ে যেন পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের মাথায় একটা কলা গাছ। বড় চওড়া চাওড়া পাতা। তার শিকড় নীচের দিকে নেমে এসেছে। তার প্রায় দু' ফুট নীচে লাল মাটি কাঁকড়ের স্তর। আর সেইখানে সারি সারি গাঁথা রয়েছে একের পর এক খোলামকুচি।

মাটি ধ্বসে নামাতে মাটির নীচ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে দশ বারোটি কলসি, হাড়ি, গামলার ভাঙ্গা টুকরোর একটি স্তূপ। রোদ পেয়ে চক্-চক্ করে হাসছে।

এঙলিঙ চাপা গলায় বললেন, "ইউলেখা····ইউলেখা।" কিন্তু তার গলার উল্লাস তাতে ঢাকা পড়লো না।

১০.

গড়বেতার গড়খাই। কারা কবে কেটেছিল তার হিসাব নেই। তবে যারা গড় কেটেছিল তারা হিসাব করেই কেটেছিল। রাজধানী মজবুত করতে গড় খোঁড়া হয়। গড়ের সামনে থাকে বিশাল দরজা, আটকে দিলেই নগর দুর্ভেদ্য দুর্গ।

গড়বেতার চারদিকে চারটি দরজা ছিল। দরজাগুলির প্রচলিত নাম সিংহদ্বার। উত্তরে লাল দরজা, পূর্বে রাউতা দরজা, পশ্চিমে হনুমান দরজা, দক্ষিণে পেশা দরজা। আর আছেন চারদিকে চারজন পাহারাদার। গোরা খাঁ পীর, ওলাই-চণ্ডী, বাঘরায়, বারভূঁইঞা। পটলমামা এসব কথা যখন ভাবেন খুব আশ্চর্য হয়ে যান।

বাংলার অনেক দেশ তো দেখলেন। পীর, গাজী, দেবতার থান কম দেখেন নি। কিন্তু হিন্দু গ্রামের মধ্যে গড়ের এক দেবতা গোরা খাঁ পীর, তা দেখেন নি। ওলাই-চণ্ডী একদিক রক্ষা করছেন, গড়ের অন্যদিক বাঘরায় রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু শিলাবতী নদীর দিক গোরা খাঁ পীরের হাতে কেন তার কোন জবাব পেলেন না।

ভাবতে ভাবতে হাঁটছেন। কিন্তু আর ভাবার সুযোগ হল না। গড়ের খাড়ি ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠছে। দু'পাশে লাল মাটি। মাঝে মাঝে গাড্ডার মত। গাড্ডায় জল জমে আছে। উপরে চাঁদোয়ার মত নীল আকাশ। কিন্তু সে আকাশ জলের মধ্যে নিজের মুখ দেখার সুযোগ পায় নি। জলের রং লাল—রক্তের মত লাল।

এওলিও জলের সামনে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, "লেদ ওয়াতাল। লেদ ওয়াতাল।"

পটলমামাও থামলেন। বললেন, "খুনের রক্তের মতলাল জল।"

কোথায় যেন একটা মুরগী কোঁ কোঁ করে উঠলো। পটলমামা কোন

মুরগী দেখতে পেলেন না। খাড়া পাড় এখনো মাথার সামান্য উপরে।

আর একটু উঠতেই দেখতে পেলেন গ্রাম। মাটির দেওয়াল। মাথায় বিচালীর চাল। বাউরী গ্রাম। মুরগী শুয়োর ঘুরে বেড়াচ্ছে। দক্ষিণ দিকে খোলা মাঠ। লাল সালু কে যেন বিছিয়ে রেখেছে। সালুর উপর কাঁকর বিছানো। রোদ পড়েছে। খাঁ খাঁ করছে লাল সালু। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ জ্বালা করে।

এতক্ষণে পটলমামার খেয়াল হল। এতটা পথ হেঁটেও কোন পাখী দেখেন নি! এখন বুঝতে পারলেন কেন এদিকটায় পাখী আসে না। অস্ফুট গলায় বললেন, "গনগনির খোল। গন্‌গন্ করে যেন তৃষ্ণার তাপে জ্বলছে।"

এঙলিঙ উঠে এসে পাশে দাঁড়ালেন। বললেন, "ঘন্‌ঘনি। থথান-থথান। গাথ না, ঘাত না, পাথ্থল, লাল পাথ্থল। লেদ থথান।"

পটলমামা গড়ের পাড় বেয়ে আরো খানিকটা হেঁটে গেলেন। দেখতে পেলেন গাছটিকে। গড়ের বাইরে ঠিক গনগনির আরম্ভে সবুজ অশ্বত্থ গাছটি দাঁড়িয়ে আছে সবুজ পাতা নিয়ে। সেই যেন গড়বেতার প্রাণের শেষ সীমানা।

পটলমামা এগিয়ে গেলেন। গাছটি বেড়া দিয়ে ঘেরা। কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন একগাদা হাতী ঘোড়া। মাঝখানে কালো পাথর আর ত্রিশূল। সিঁদুর লেপে লেপে তার আসল চেহারা লুপ্ত করে দিয়েছে। ঘোড়া হাতীগুলিও সিঁদুরে রক্তাক্ত।

পটলমামা বললেন, "ওলাই-চণ্ডী।"

এঙলিঙ চোখের চশমা নামিয়ে দেখলেন। হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে বললেন, 'গদ্. ওলাইচন্দী। ভেলী ফাইন, হাথী, ঘোলা।" ঘুরে ঘুরে চিবুকের শেষ প্রান্ত নাচিয়ে নাচিয়ে দেখতে লাগলেন।

তিনটি যুবক গড়বেতার দিক থেকে গড়খাই পার হয়ে উঠে এল। তাদের হাতে তাস। পটলমামা আর এঙলিঙকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। একজন বিস্মিত গলায় বললো, "আপনারা?"

পটলমামা মুখ তুলে দেখলেন তাদের। বললেন, "আগন্তুক।"

যুবকটি অবাক হয়ে বললো, "ওলাই-চণ্ডী দেখতে এসেছেন?"

এঙলিঙ মাথা দুলিয়ে মিহি সুরেলা কণ্ঠে বললেন, "ইয়েত··· ইয়েত।"

যুবকটি হেসে বললো, "ওলাই-চণ্ডী দেখার কি আছে? বাউরীরা পূজা করে। এ আবার কেউ দেখতে আসে নাকি!"

পটলমামা বললেন, "কেন দেখবে না? এ তো দেখার মত বলার মত একটা ঘটনা।"

যুবকটি হাসি সামলে বললো, "কেন?"

পটলমামা জিগ্যেস করলেন, "পুরোহিত ব্রাহ্মণ না বাউরী?"

যুবকটি বললো, "বাউরী।"

পটলমামা বললেন, "পূজো তো ব্রাহ্মণরা করে। এখানে বাউরি পুরোহিত পূজো করে কেন ভেবে দেখেছো?"

যুবকটি মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল কখনো ভাবে নি।

পটলমামা গাছের ছায়ায় বসলেন। পাইপটা জ্বালিয়ে নিলেন। যুবক কয়টি বসে পড়লো। পটলমামা একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "দেশ কার বা কাদের?"

যুবক কয়টি কোন জবাব দিল না। নীরবে পটলমামার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

পটলমামা পাইপটা কামড়ে রেখে বললেন, "আমরা নয়। যারা মাটির সঙ্গে আছে তারাই ভূমিজ। ভূমি থেকে জাত তাই ভূমিজ। তারা এইসব বাগ্দী, বাউরী, হাড়ী, ডোম, জোলা, মালো তারাই। আমরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। ওদের শ্রমলব্ধ ফল চালাকী করে ভোগ করছি। ওদের দারিদ্রতার মধ্যে গ্রামের পাশে ফেলে রেখেছি।"

যুবক ক'টির দিক থেকে কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল না। পটলমামা হতাশ হয়ে পাইপটা আবার কামড়ে ধরলেন। বললেন, "এরাই বাংলার খাঁটি বাঙ্গালী। বহিরাগত শক্তি এ দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শাসন করেছে শোষণ। আমরা শোষকদের সাহায্য করে অভিজাত। ওরা প্রতিরোধ করেছে। ওলাই-চণ্ডীর থানে আর্য ব্রাহ্মণকে ঢুকতে দেয় নি।"

একটি যুবক বললো, "আশ্চর্য!"

পটলমামা বললেন, "ইতিহাসের পাতায় আরো অনেক আশ্চর্যকর ঘটনা আছে।"

১১

পটলমামা পাইপে কয়েকটা দীর্ঘ টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া উগড়ে দিলেন। ধোঁয়ায় তাঁর মুখ ঝাপসা হয়ে গেল। সেই ধোঁয়ার আড়াল থেকে বললেন, "রাজা-মহারাজাদের ইতিহাস শুধু দেশের ইতিহাস নয়। যারা চাষ করে, জঙ্গল সাফ করে, গ্রাম-নগর গড়ে তোলে তারাই যথার্থভাবে ইতিহাসের উপাদান। তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে কি ছিল আমাদের দেশ।"

পটলমামা থামতেই এগুলিঙ চোখ থেকে চশমা নামিয়ে উত্তেজিত ভাবে বললেন, "বাঘতী, বাকূলী, থান্‌তাল...."

পটলমামা হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, "আর্যদের আসার আগে অনার্যরা ছিল। তারাই এ দেশের মানুষ। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল। তারা উন্নততর এক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতো। এখানে আদি প্রস্তর যুগ থেকেই যে মানুষ ছিল তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে।"

পটলমামা থামতেই একটি যুবক বললো, "আমরা শুনি নি।" সে তার হাতের তাস লুকিয়ে ফেললো। তাস খেলতে এখানে এসেছিল তা প্রকাশ করতে এখন লজ্জা পাচ্ছে।

পটলমামা হঠাৎ হাত তুলে একটি যুবকের বুকে খোঁচা মেরে বললেন, "বৎস, তুমি কি অবগত আছ যে তোমার প্রপিতামহরা হরিণের শিং দিয়ে তৈরী করেছিল হারপুন। হাড় ও তামার বঁড়শী। একটি চোয়ালে দন্তপংক্তির স্থানে ছোট ছোট পাথর সন্নিবেশ করে তৈরী করা হয়েছিল শস্যছেদক। বৎস, অবগত হয়ে থাক, এই শস্যছেদক প্রাচ্য ভারতের প্রাচীনতর কাস্তে।"

এগুলিঙ চোখের চশমা খুলে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হেসে উঠলেন। কিন্তু যুবক কয়টি হাসলো না। তারা হাঁ করে পটলমামার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

পটলমামা বললেন, "এই মেদিনীপুর থেকেই এসব পাওয়া গেছে। এবার ভেবে দেখ কত প্রাচীন সভ্যতার বংশধর তোমরা।...."

পটলমামা তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই আর্ত চীৎকার গনগনির মাঠের উপর থেকে ভেসে এসে আছড়ে পড়লো। সবাই চমকে উঠলো। কিছু বুঝতে পারার আগে আবার চীৎকার ভেসে এল। কে যেন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বাঁচার তাগিদে শেষবারের মত আশ্রয় খুঁজছে।

স্তব্ধ হল পরিবেশ। গনগনির মাঠ তপ্ত কড়াই হয়ে বুক চিতিয়ে শুয়ে আছে। রোদের তাপ যেন মাটির উপর থেকে সাপের মত এঁকে-বেঁকে উঠে আসছে। তাই হাওয়া পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে আছে।

আবার বাতাস চিঁড়ে আর্ত হাহাকার ভেসে এল, "বাঁ—চা—ও....বাঁ—চা...."

যুবক কয়টি এবার এক লাফে উঠে দাঁড়ালো। তারপর লাফিয়ে নামলো গড়ের মধ্যে। দৌড়ে গড়ের পাড় বেয়ে উঠলো। দ্রুত পায়ে, দৌড়ে পালিয়ে গেল বাউরী পাড়ার উপর দিয়ে আচার্য পল্লীর দিকে।

পটলমামা আর এঙলিঙ দু'জনের দিকে তারা ফিরেও তাকালো না একবার।

পটলমামা উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এঙলিঙ। বললেন, "ইত ইদ্ মার্দাল কেথ।" গলা তার কেঁপে গেল।

পটলমামা বললেন, "হ্যাঁ, একটা খুন হচ্ছে। কে কাকে খুন করছে তা জানা দরকার। হয়তো তাকে বাঁচানো যাবে।"

পটলমামা গনগনির মাঠ পাড়ি দিয়ে ছুটলেন খাড়ির দিকে। হাজার হাজার শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে থাকা খাড়ি থেকেই শব্দ এসেছিল।

এঙলিঙ ছুটে গিয়ে পটলমামার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, "নো-নো। ওখানে বিপড। দেইঞ্জার...."

পটলমামা শুনলেন না। বললেন, "মানুষ খুন হতে দেওয়া যায় না। ফলো মি।"

পটলমামা ছুটলেন। পিছনে পিছনে ছুটলেন এঙলিঙ। তাঁর ছুটতে কষ্ট হচ্ছিল। পায়ের নীচে শুকনো মাটি আর কাঁকড়। পা পিছলে যেতে চাইছে। হয়তো বা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবেন।

শেষ অবধি খাড়ি পর্যন্ত যেতে হল না তাঁদের। তার আগেই খাড়ি থেকে উঠে এল একটি যুবক। উঠেই দৌড় দিল। পটলমামার পাশ দিয়ে

বেড়িয়ে গেল তীরের মত।

পটলমামা থমকে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই দেখতে পেলেন তিনটি যুবককে। হাতে চক্‌চকে ছুরি। হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে খাদের মধ্যে। তাদের শিকার হাতছাড়া হয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচেছে।

তারাও দেখলো পটলমামাকে। পটলমামাকে দেখেই তারা দু' পা পিছিয়ে আর একটা খাড়ির মধ্যে ঢুকে পালিয়ে গেল। এবার এ খাড়ি ও খাড়ি হয়ে তারা পালিয়ে যাবে।

এগুলিও হাত দিয়ে কপালের ঘাম ফেললেন। ঘামে তাঁর মুখ ভেজা। বললেন, "দিথ্‌মিথ....দিথ্‌মিথ্‌ হু ঘেম।"

১২

পটলমামা চুপচাপ হাঁটতে থাকলেন। মনে মনে বললেন, কোন খেলাই শেষ হয় না। থেকে যায় স্মৃতি। একটা মানুষকে গনগনির খোলায় খুন করা যায়। ঘটনা সেখানেই থেমে থাকে না। যদি বা থেমে যায় তাকে শেষ হয়ে যাওয়া বলা যায় না। আবার দৃশ্যপট উন্মোচিত হতে পারে। শত শত বছর পরে। এমন হতে পারে হাজার বছর পার হয়ে গেল। শীত এল, গ্রীষ্ম গেল। হাজার হাজার বছরের মাটি জমে উঠলো তার উপর। এমন কি দশ হাজার বছর পার হয়ে গেল। তারপর একদিন—

নদী খয়ে খয়ে মাটি নিয়ে চলেছে। মাটি নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে মোহনায়। সেখানে ব-দ্বীপ গড়ে উঠছে। ব-দ্বীপের নীচে চাপা পড়ে গেল। সবটা গেল না। কিছু থেকে গেল মাটির মধ্যে। নদীর খাড়াই দেওয়ালে।

একদিন এক অপরাহ্ণ বেলায় এক প্রত্নবিজ্ঞানী এলেন নদীর তীরে অনুসন্ধানে। তীক্ষ্ণ সতর্ক চোখে দেখছেন। হঠাৎ চোখে পড়লো বিবর্ণ একটি হাড়। ফসিল হয়ে কাঁকর বালির মধ্যে গেঁথে আছে। গেঁথে আছে

এক যুবকের চোয়াল। দেহের অন্যান্য অংশ মহাকাল, মাটি, নদী গ্রাস করেছে। গ্রাস করে নি অথবা করতে পারে নি যুবকের চোয়ালটি। অথবা চোয়ালটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে অতীতের নমুনারূপে।

চোয়ালটিকে মাটি থেকে বের করে আনা হল। দেখা গেল অনুমান যথাযথ। দশ হাজার বছর আগে যুবকটি বেঁচে ছিল। সে পশু শিকার করে প্রাণধারণ করতো। হয়তো পাথর ঘসে অস্ত্র তৈরী করতো। সে একা নয়। আরো দু'চারজন মানুষ ছিল তার সঙ্গে। তারা সমবেতভাবে বাঁচবার জন্য চেষ্টা করেছে।

বাঁচতে চাইলেই বাঁচা যায় না। মৃত্যু অনিবার্য। অপঘাতে হতে পারে আবার স্বাভাবিক ভাবেও হতে পারে। প্রাচীন পৃথিবীতে অপঘাতেই মৃত্যু হত বেশি। জীবনে ছিল না কোন নিরাপত্তা।

একদিন যুবকটির মৃত্যু হল। কিভাবে মৃত্যু হল? কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিতে হবে। হয়তো তার সঙ্গীরাই হঠাৎ আক্রমণ করে মেরে ফেলেছিল। কোন জীবজন্তুর আক্রমণেও মৃত্যু হতে পারে।

যে মরেও মরলো না। তার চোয়াল বেঁচে থেকে আজকের মানুষের কাছে পৌঁছে দিল সেদিনের মানুষের খবর। খবর সংক্ষিপ্ত, সংবাদপত্রের হেডিংয়ের মত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ খবর। ভারতবর্ষের সর্ব প্রাচীন নর করোটির স্বাক্ষর মানুষের হাতে তুলে দিল মেদিনীপুরের 'সিজুয়া' গ্রাম।

পটলমামা নিজের ভিতর গভীর ভাবাবেগ অনুভব করলেন। একটা আঙ্গুল তুলে বললেন, "সিজুয়া ম্যান, সিজুয়া ম্যান...."

এঙলিঙ থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে পড়লো 'সিজুয়া' চোয়ালের কথা। পশ্চিমবঙ্গ প্রত্ন সংগ্রহশালায় গিয়ে নিজে দেখে এসেছেন সেই চোয়াল। দশ হাজার বছর আগের এক যুবকের চোয়াল। তিনি বললেন, "ইয়েত, ইয়েত—থিতুয়া ম্যান ফম থিতুয়া!"

পটলমামা চোখ বুজে যেন রামগড়ের 'সিজুয়া' গ্রামের কংশাবতী নদীর তীর দেখতে চাইলেন। লালচে উপলরাশির মাঝখানে প্লাইস্টোসীন পর্বে গেঁথে আছে একটি মানুষের চোয়াল। চোয়ালটি ভাঙ্গা, তাতে কিছু আসে যায় না। মানুষের চোয়াল। প্লাইস্টোসীন পর্বের মানুষের চোয়াল।

মহেন্‌জোদড়োতে পাওয়া মানুষের কঙ্কালের আগের। দশ হাজার বছর আগের মানুষ! কিন্তু চোয়ালটি ভাঙ্গা কেন? পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিল? হঠাৎ কোন জন্তু আক্রমণ করেছিল? গোষ্ঠীর কোন মানুষ ঈর্ষাবশত খুন করেছিল?

আজ আর তার জবাব পাওয়া যাবে না। শুধু জানা যাবে একটি মানুষের নিহত হবার খবর।

পটলমামা বিড় বিড় করে বললেন, "মানুষ মানুষকে খুন করে। পৃথিবীতে এর থেকে বিস্ময়কর আর কি থাকতে পারে?"

এঙলিঙ শুনলেন। মাথা নেড়ে বললেন, "নাথিং....নাথিং।"

১৩

সন্ধ্যা উতরে গেল, এঙলিঙ ফিরে এলেন না। চিন্তা ক্রমশঃ দুঃশ্চিন্তায় পরিণত হল পটলমামার। সেই দুপুরে বেরিয়ে গেছেন বাঘরায়ের থান দেখতে। গড়বেতার দু'দিকের সীমানা পাহারা দেয় বারভুঁইঞা আর বাঘরায়।

বাঘরায় নিশ্চয় ধর্মঠাকুরের নাম। প্রথম নাম বাঘরায়। বাঘের দেবতা। আরণ্যের মানুষ বাঘকে ভয় পায়, ভয় পাবারই কথা। ভয় থেকেই তো পূজার্চনার উদ্ভব।

যেখানে বাঘ সেখানে বাঘের পূজো। সুন্দরবনে এখনো বাঘের পূজো হয়। তাকে বলে বনবিবি। বনবিবিকে পূজো না দিয়ে সুন্দরবনে ঢোকার কথা ভাবে না মানুষ। বাঘরায় নানা এলাকায় ধর্মঠাকুর নাম নিয়ে বেঁচে আছে।

ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুরের লোকেরা বাঘরায়ের পূজো করবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। গড়বেতার চারিদিকে ছিল গভীর শালবন। সেই অরণ্যে আরণ্যক মানুষ বাস করতো।

কিন্তু এঙলিঙ ফিরে আসছেন না কেন? ক্রমশঃ পটলমামার উদ্বেগ বাড়ছে। এখানে আসা থেকেই কারো কারো নজরে তাঁরা পড়েছেন। কিছু মানুষ

তাঁদের দু'জনকে অনুসরণ করেছে। কি সে উদ্দেশ্য তা বোঝা যাচ্ছে না।

যত ভাবছেন তত চিন্তা বাড়ছে। পটলমামার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। থলে থেকে প্যাডের কাগজ বের করতে গেলেন। দেখলেন থলে নেই, এঙলিঙ নিয়ে গেছেন। মুখ ভাঁড় করে বসে রইলেন।

হঠাৎ বিষ্ণুপুরের কথা মনে এল। এঙলিঙ বিষ্ণুপুর যান নি তো! যাবার কথা বলেছিল। বিষ্ণুপুরের রাজারা একসময় গড়বেতা দখল করেছিল। তবে নিজেরা এখানে এসে শাসন করে নি। তাদের হয়ে স্থানীয় রাজারাই রাজ্য শাসন করতো। দুর্জন সিংহ তখন মল্লভূমের রাজা।

মল্লরাজারা যে নানা কারণে বার বার গড়বেতা দখল করেছে তা রাধামাধবের মন্দির দেখেই সন্দেহ করেছিলেন। বঙ্কিম আটচালা জাতীয় চাল গড়ার নমুনাই প্রথম ধাক্কা দিয়েছিল। অবশ্য গড়বেতার পাশেই মল্লভূমি বিষ্ণুপুর। শিল্পরীতিতে তার ছাপ পড়া অস্বাভাবিক কিছু নেই। তবুও পটলমামা নাকে গন্ধ পেয়েছিলেন।

এটা হয়। পুরণো সভ্যতার কোন কেন্দ্রে পা দিলেই তিনি গন্ধ পান। বিচিত্র সে গন্ধ। হাজার হাজার মানুষের ঘামের গন্ধের মত। তারা যেন তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়। মৌনমুখে বলে, 'আমাদের দেখুন। আমরা একসময় পৃথিবীতে আপনাদের মত বেঁচে ছিলাম। গায়ের ঘাম ঝড়িয়ে সভ্যতার ইট গেঁথেছি। তারপর হারিয়ে গেলাম। হারিয়ে যেতে মানুষ চায় না। সে চায় বাঁচতে। আপনি আমাদের কথা শুনুন। আমাদের কথা সবাইকে বলুন।'

পটলমামা তখন নিজের ভিতর রোমাঞ্চ অনুভব করেন। গড়বেতার রাধামাধব মন্দিরে দাঁড়িয়ে এমনি রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলেন। তখনই চোখে পড়ে মন্দিরের গায়ে খোদাই করা লিপি। "শ্রীমল্লভূরমণ দুর্জনসিংহ দেবঃ সৌধনেবেদয়দিদম্" কথাগুলির উপর চোখ আটকে গিয়েছিল। তারপরেই এঙলিঙ বলেছিলেন বিষ্ণুপুরের কথা।

দুশ্চিন্তা পটলমামাকে বসে থাকতে দিল না। তিনি শেষ পর্যন্ত রাস্তায় নেমে এলেন। এঙলিঙকে খোঁজার জন্য নয়। তিনি খোঁজার মত মানুষ নন। যখন আসার তখন ঠিক আসবে। কিন্তু নিজেকে স্থির রাখতে পারছেন না।

১৪

হাঁটতে হাঁটতে শ্মশানের কাছে চলে এলেন। সামনেই শিলাবতী। পাশে সাধুজীর আশ্রম। ঘন গাছপালার মধ্যে প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে। পটলমামা ধীরে ধীরে গেট খুললেন। উপরে উঠে দেখতে পেলেন সাধুজীকে। চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। পটলমামা উপরে উঠতেই চোখ খুললেন। চিনতে পেরে বললেন, "আসুন-আসুন।"

পটলমামা পাশের খাটিয়ায় বসলেন। একটা রাতজাগা পাখী ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। এক মুঠো আকাশমণি ফুল ঝরে পড়লো।

পটলমামা পাইপ মুখে লাগালেন।

সাধুজী বললেন, "আপনি আসাতে ভাল লাগছে। সকালে আপনার পুরোপুরি পরিচয় নেওয়া হয় নি।"

পটলমামা মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন, "বলার মত তেমন কিছু নেই। বলতে পারেন, ভূত। ভূত হয়ে সংসারের মধ্যে বসে আছি।"

সাধুজী খলখল করে হাসলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, "এখানে শ্মশান-কালী আছে বলে আপনি ভূত হলেন?"

পটলমামা বললেন, "না, তা নয়। আসলে বর্তমান অপেক্ষা যা অতীত তাই আমার ভাল লাগে। তা মশায় জীবিত মানুষের আর অতীত কতটুকু! সেজন্য বেশী অতীত পেতে হলে মরা মানুষের খোঁজ নিতে হয়। জ্যান্ত মানুষ কি মরা মানুষের সঙ্গ করে? অতীত নিয়ে থাকি বলে ভূত বললাম।"

সাধুজী বললেন, "এখানে বাইরের মানুষ এলে ভূত হয়ে যায়।...." কথাটা শেষ না করেই হাসলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, "তাল-বেতালের দেশ তো! স্বয়ং বিক্রমাদিত্য বেতাল-সিদ্ধ হয়েছেন এই গড়বেতায়। বেতালের গড় থেকেই গড়বেতা।"

পটলমামা গল্প পেয়ে নড়েচড়ে বসলেন। পাইপটাকে কামড়ে ধরে

বললেন, "কি রকম ?"

সাধুজী বললেন, "যে শ্মশানের পাশে বসে আছেন এই শ্মশান থেকেই শব তুলে নিয়েছিলেন বিক্রমাদিত্য। সাধনায় বসে সিদ্ধি লাভ করলেন সর্বমঙ্গলা মন্দিরে। তাল-বেতাল এসে দাঁড়ালো সামনে।"

পটলমামা এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "তারপর ?"

সাধুজী উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে বসলেন। বললেন, "অমাবস্যার অন্ধকার। হাতের কাছে কি আছে তা দেখা যায় না। শবের উপর বসে আছেন বিক্রমাদিত্য। চারদিকে ভূত-প্রেত। ভাবলেও গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।"

পটলমামা বললেন, "কি বলছেন মশাই! খুব সাহসতো লোকটির।"

সাধুজী অবাক হয়ে বললেন, "লোকটি কি মশাই! বিক্রমাদিত্য, মহারাজ বিক্রমাদিত্য।"

পটলমামা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "আপনি বলুন।"

সাধুজী বললেন, "তাল-বেতাল এসে দাঁড়ালো। বললো, 'হুকুম করুন, যা বলবেন তাই করবো। আমরা আপনার ক্রীতদাস'।"

সাধুজী থামলেন। নিস্তব্ধতা নেমে এল দু'জনার মাঝখানে। মাথার উপর সামান্য এক টুকরো আকাশ। আকাশমণি ফুলের মতো হাজার হাজার তারা ফুটে আছে। শীলাবতীর উপর ছায়াপথ। অন্ধকার যেন আকাশ থেকে ঝরে নামছে। গাছপালার আড়ালে দেখা যাচ্ছে ক্ষীণ চাঁদ। মেঘ তাকে ঢেকে রেখেছে। বিচিত্র এক রহস্যময় পরিবেশ তৈরী হয়েছে।

সাধুজী সে পরিবেশ ভাঙলেন। বললেন, "বিক্রমাদিত্য ভাবলেন তাল-বেতালের শক্তি পরীক্ষা করবেন। বললেন, 'সর্বমঙ্গলা মন্দিরের দরজা উত্তর দিকে করে দিতে পারবে?' তাল-বেতাল আনত হয়ে বললো, 'আপনি আদেশ করুন, মহারাজ।' তাল-বেতাল ঐ বিশাল মন্দির ঘুরিয়ে বসিয়ে দিল। সেই থেকে সর্বমঙ্গলা মন্দিরের দরজা উত্তর দিকে। মা নিজেও উত্তর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।"

পটলমামা মুখ থেকে পাইপটা নামালেন। বললেন, "গল্প গল্পই। গল্প সব সময় সত্য কথা বলে না।"

সাধুজী অবাক হয়ে বললেন, "আমার কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না!"

পটলমামা হেসে বললেন, "অবিশ্বাসের কথা নয়। আমাদের দেশে শক্তিশালী ওঝা, গুণীন, ভৈরব এরা অনেক সময় বেতাল-সিদ্ধ বলে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তেমনি কোন শক্তিশালী প্রভাবশালী গুণীন অথবা ভৈরব ওখানে থাকতেন। নরবলি দিয়ে পূজো করার সঙ্গে অদ্ভূত সব মন্ত্রের কাজ দেখাতেন। তাই ভক্তের অভাব হল না তাঁর। ভক্তদের কাছে তিনি বিস্ময়কর পুরুষ। তাই তাঁকে বেতাল-সিদ্ধ বা বেতাল ভাবা অস্বাভাবিক নয়। বেতাল থেকে বেতালের স্থান, বেতালের গাঁ, বেতালের আগার, বেতাল বসতি, গড় বেতাল থেকে গড়বেতা নাম আসতে পারে।"

সাধুজী আশ্চর্য হয়ে বললেন, "এ রকম হয় নাকি?"

পটলমামা হেসে বললেন, "বাংলার গ্রামাঞ্চলে আক্‌ছাড় হচ্ছে। রাজা বিক্রমাদিত্য, গ্রাম-দেবতা এ সবের অভাব নেই।"

সাধুজী কোন কথা বললেন না। পটলমামা কতটা সত্য কথা বলছেন তা বোধ হয় ভাবছেন। বুঝতে পারছেন না মন্দিরের দরজা কি ভাবে উত্তর দিকে গেল।

পটলমামা সাধুজীর মনের কথা বুঝতে পারলেন। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "সর্বমঙ্গলা মন্দিরের উত্তর দিকে দরজা কেন তার উত্তর খুব কঠিন নয়। সর্বমঙ্গলা মন্দির উড়িষ্যার রেখ-দেউলের রীতিতে তৈরী। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে তৈরী। তৈরী করেছিলেন উড়িষ্যার রাজারা।"

সাধুজী বললেন, "কিন্তু উত্তর দিকে দরজা...."

পটলমামা তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিলেন, বললেন, "সে জবাব দিচ্ছি। তার আগে উড়িষ্যার রাজার তৈরী মন্দির যে সেই প্রমাণ প্রথমে বলি।"

পটলমামা আপন মনে খানিক সময় পাইপ টানলেন। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। এঙলিঙের কথা মনে এসেছিল। মনে আসতেই উত্তেজনা অনুভব করলেন। বিপদের কথা মনে এল। অবশ্য বিপদে পড়লে তা থেকে বেড়িয়ে আসার মত বুদ্ধি তিনি রাখেন। অনেক দিন ধরে দু'জনে সবার অজ্ঞাতে এক বিচিত্র জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছেন।

দেশের ইতিহাসের নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন।

সাধুজী বললেন, "বলুন আপনার প্রমাণ।"

মুহূর্তে নিজেকে স্বাভাবিক করে নিলেন পটলমামা। বললেন, "বলবো বৈকি। রেখ-দেউলের প্রথম প্রমাণ দিয়েছি। এবার দ্বিতীয় প্রমাণ। আচ্ছা, এখান থেকে 'উড়িয়াশাহী' গ্রাম কত দূরে?"

সাধুজী বললেন, "বেশি দূরে নয়, চন্দ্রকোণা রোডের পাশে।"

পটলমামা বললেন, "হ্যাঁ, বেশি দূরে নয়। গ্রামটি আমি ঘুরে দেখেছি। গড়বেতার গায় এ রকম উড়িয়াবাসীদের কলোনী দেখে প্রথম খুব অবাক হয়েছিলাম। হঠাৎ একটা উড়িয়া গ্রাম কি করে মেদিনীপুরের জঙ্গলের পাশে গড়ে উঠলো! বেতাল একটা গ্রাম উড়িষ্যা থেকে তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছে?"

পটলমামার কথা শুনে সাধুজী হাসলেন। বললেন, "তাই হয় নাকি?"

পটলমামা গম্ভীর হয়ে বললেন, "হবে না কেন? মন্দির ঘুরিয়ে বসিয়ে দিতে পারে আর একটা গ্রাম তুলে আনতে পারবে না?"

সাধুজী চুপচাপ রইলেন। কি বলবেন বুঝতে পারছেন না। বিপন্ন হয়ে বার বার হাত তুলে মাথায় বোলাতে থাকলেন।

পটলমামা বললেন, "এরাই হল সেই কারিগর যারা সর্বমঙ্গলার মন্দির তৈরী করেছিল। তারা এখানে এসে রাজার হুকুমে মন্দির তৈরী করেছে, রাজার কর্মচারীর কাজ করেছে। তারপর একদিন গড়বেতা স্বাধীন হয়েছে। এরা আর যায় নি। তাদের বংশধররা উড়িয়াশাহীতে বহাল তবিয়তে থেকে গেল। শাহী কথাটাও উড়িয়া। শাহী কথার অর্থ গ্রাম।"

সাধুজী মাথা চুলকে বললেন, "এসব কথা কখনো ভাবি নি। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি তাল-বেতালের গল্প।" কথা শেষ করেই তিনি হাতে তালি দিলেন। বললেন, "যা-যা—"

পটলমামা নীচের দিকে তাকালেন। যা দেখতে পেলেন তাতে শিউরে ওঠার কথা। তাঁর পায়ের কাছে হাত পাঁচেক লম্বা একটা সাপ।

সাধুজী বললেন, "নড়বেন না। চুপচাপ বসে থাকুন। নিজেই চলে যাবে। গুটি ছয়েক এনারা এখানে আছেন। আমাকে বোধহয় ভালোবেসে ফেলেছে। তাই মাঝে মাঝে একেবারে পায়ের কাছে চলে আসে।"

পটলমামা কাঠ হয়ে বসে রইলেন।

১৫

এঙলিঙ যা ভাবেন নি তাই পেলেন। বাঘরায় থান থেকে ফেরার পথে দেখতে পেলেন। পুকুরের পারে বাউড়ীদের ঘর। দরিদ্র মানুষের খান তিনেক ঘর। মাথায় বিচালীর চাল, মাটির দেওয়াল। রাস্তার পাশে উঠান। উঠানের একপাশে একটা বড় শাল গাছ বেখাপ্পাভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে শাল গাছ থাকার কথা নয়। লাগানো গাছ। হয়ত এক সময় ছিল, তার স্মৃতি রক্ষা করতে গাছ মরতে আর একটা গাছ লাগানো হয়েছে। তাতেই এঙলিঙ বিস্মিত হলেন।

খানিকটা এগিয়ে গেলেন। শাল গাছের নীচে লেপা-পোছায় তক্‌তকে। কতগুলি হাতী-ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। তৈরী দেবস্থানটি অনেক প্রাচীন। হাতী-ঘোড়া দু'চারটি ভাঙ্গা এবং বিবর্ণ। কোন কোন হাতী-ঘোড়া মাটির ভিতর তলিয়ে গেছে। তিনি আরো কাছে এগিয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন না কি ভাবে হাতী-ঘোড়া মাটির নীচে তলিয়ে গেল। পরেই মনে হল, এ তো স্বাভাবিক। প্রতিবার পূজোয় যত্ন করে মাটি গোবর লেপা হয়। একটু একটু করে মাটি উঁচু হয়—গ্রাস করে হাতী-ঘোড়া। এমনি করে পুরণো দু'চারটা হাতী-ঘোড়া মাটির নীচে তলিয়ে গেছে।

আরো কাছে এগিয়ে গেলেন। গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখা ছোট এক খণ্ড পাথর। একখানা পাথর পেতে আসন করে তার উপর বসিয়ে রেখেছে। সিঁদুর মাখানো। এঙলিঙ বুঝতে পারলেন, এ কোন দেবতার প্রতীক।

পাথর খণ্ড ভালো করে দেখার জন্য আরো কাছে গেলেন। এবার চমকে উঠলেন। পাথর খণ্ডটি কালো হয়ে আছে। তা থাক, এ পাথর খণ্ড যে সাধারণ নয় তা বুঝতে পেরেছেন। উত্তেজনায় টান-টান হয়ে গেলেন। চিবুকের শেষ প্রান্তে ঝুলে থাকা গোঁফ থর-থর করে কাঁপতে লাগলো।

চিনতে পারলেন পাথর খণ্ডটিকে। এটি একটি পাথরে তৈরী কুঠার। মনে পড়ল, এমনি কুঠার তিনি দেখেছেন সংগ্রহশালায়। কুঠারের নাম দেওয়া হয়েছে 'সস্কন্ধ কুঠার।' নামটি গালভরা হলে কি হবে, হাসবার উপায় নেই। মসৃণ করে কুঠারটি তৈরী। এঙলিঙের মনে পড়লো দূর প্রাচ্যের সমুদ্রের নানা দ্বীপের কথা। মালয়, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি এলাকা থেকে পাওয়া কুঠারের সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

তিনি নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। প্রস্তর যুগের একটি হাতিয়ার দিব্যি দেবতার প্রতীকে পরিণত হয়ে পূজা পাচ্ছে! যারা পূজা করছে তারা কল্পনা করতে পারবে না ইতিহাসের কোন্ রহস্য তারা গাছতলায় ফেলে রেখেছে।

এঙলিঙের মনে পড়লো পটলমামার কথা। সুইডেনের প্রত্ন বিজ্ঞানী-দের সভায় একটা প্রবন্ধ পাঠ করে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। বিষয়টি ছিল 'প্রি-দ্রাবিড়ান ইন বেঙ্গল'। তাতে তিনি বলেছিলেন, প্রস্তর যুগ শেষ হবার আগেই বাঙ্গলার অষ্ট্রোলয়েড জনগোষ্ঠীর মানুষরা নৌকো তৈরী বা নৌকো জাতীয় কোন যান আবিষ্কার করেছিল। এটা স্বীকার না করলে ব্যাখ্যা করা যায় না পূর্ব ভারত ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস। একই কৃষি নির্ভর সমাজ এবং পারস্পরিক লেনদেনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

পটলমামার পঠিত প্রবন্ধ নিয়ে অনেক হৈ চৈ হয়েছিল। স্পষ্ট কোন প্রমাণ তিনি পেশ করতে পারেন নি। সবটাই ছিল ভাষাতত্ত্ব আর নৃতত্ত্বের যুক্তিতে অনুমান। এখন তেমনি এক জীবন্ত প্রমাণের মুখোমুখি এঙলিঙ।

নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। কারো দেবস্থানে হাত দিতে নেই। কোন মানুষের বিশ্বাসের অমর্যাদা করা ঠিক নয়। পরের জিনিষ না বলে নেওয়াকে চুরি করা বলে—এসব কথা তিনি জানেন। তবু নিজেকে সামলাতে পারলেন না। কুঠারটি টুক্ করে তুলে থলের মধ্যে ঢুকিয়ে থলেটি

পিঠে তুলে দাঁড়ালেন।

সরে পড়তে পারলেন না। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো বাউরী বুড়িকে। ঘর থেকে বেড়িয়ে তাঁকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এঙলিঙ বুঝতে পারলেন, ফ্যাসাদে পড়েছেন। এখনই ধরা পড়ে যাবেন। দেবতা চুরির অপরাধে বাউরীরা কি করবে তা তারাই জানে। দেবতার থানে বাউরীরা মুরগী, শুয়োর বলি দেয়। এবার হয়ত তাঁকেই বলি দেবে।

তিনি ঘাবড়ালেন না। মুহূর্তে নিজেকে তৈরী করে নিলেন। বললেন, "ইউ থি....ইউ থি"—বলতে বলতে বুড়ীর সামনে এগিয়ে গেলেন। বুড়ীর চোখ দেবতার থানে যাতে না পড়ে সেই চেষ্টা করলেন। হুড়মুড় করে গিয়ে বুড়ির সামনে দাঁড়ালেন।

বুড়ি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন এঙলিঙ। মাথা জুড়ে টাক। টাকে রোদ পড়ে চক্-চক্ করছে। ভুরুতে সামান্য চুল। চোখে চশমা। চিবুকের শেষ প্রান্তে কয়েকগাছা লাল চুল। গায়ে কালো কোট। ঢোলা পাতলুন। পিঠে থলি। তাঁকে বিচিত্র এবং গ্রহান্তরের মানুষের মত দেখাচ্ছিল।

তিনি সামনে ঝুঁকে বললেন, "নমত্কার।" অমনি তাঁর পিঠ থেকে ঝোলা সামনে এসে পড়ল। ঝক্-ঝক্ করে আওয়াজ উঠলো। তিনি ঝোলাটাকে পিঠের উপর চালান করে দিলেন। বললেন, "ইউ থি...."

তাঁর গলা শুনে আরো কয়েকজন পুরুষ মহিলা বাইরে বেরিয়ে এল। ছেলেরা এসে ভূত দেখার মত বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল।

এঙলিঙ পকেট থেকে চট্ করে পেনটা তুলে নিলেন। 'দু' আঙ্গুলের ফাঁকে ধরে বললেন, "ইউ থি....ইউ থি" বলে কলমটিকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

কলম আকাশের দিকে উঠে গেল। আবার নেমে এল। হাত এগিয়ে শূন্য থেকে খপ্ করে কলম ধরে নিলেন। ধরে নিয়ে আবার ছুঁড়ে দিলেন। এভাবে বার পাঁচেক ছুঁড়ে হঠাৎ খুব জোরে ছুঁড়ে আর হাত এগিয়ে দিলেন না। হাত নেড়ে দেখিয়ে দিলেন, হাতে কিছু নেই। কলম আকাশে

উঠে হাওয়া হয়ে গেছে।

লোক কয়টি বিস্মিত এবং স্তম্ভিত। তাদের চোখ বড় হয়ে উঠেছে।

এঙলিঙ সবার বিস্মিত বিহ্বল মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, "দিঙ্কিং ওয়াতাল। দল, দল খাবো। আ-তেষ্টা-দল-দল-আই মিন ওয়াতাল।" হাতের ঈশারায় জলপান করার ভঙ্গী করে দেখালেন।

তিনি জল চাইছেন তা সবার আগে বুঝতে পারলো নতুন বৌটি।



হাত নেড়ে দেখিয়ে দিলেন হাতে কিছু নেই।

কয়েক মাস হয় বিয়ে করে স্বামীর ঘর করতে এসেছে। বিষ্ণুপুরের মেয়ে। তাদের গ্রাম শহরের প্রান্তে। তাই দু'একজন চীনা যাদুকর দেখার অভিজ্ঞতা আছে। তাই সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় নি।

তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর চলে গেল। এক গ্লাস জল আর থালায় দু'টি বাতাসা সাজিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। পর পুরুষের কাছে যাবে না বলে বুড়ীর হাতে ধরিয়ে দিল। বাউরী বুড়ি একটু ইতঃস্তত করে সামনে এগিয়ে এল। তাঁর সামনে ধরলো।

এঙলিঙ থালা থেকে বাতাসা দুটি তুলে টপ করে মুখে পুরে ফেললেন। গ্লাস নিয়ে জল খেলেন। গ্লাস ফেরত দিয়ে বললেন, "থ্যাঙ্কু।" কথাটা বলেই একটা পা একটু সামনে এগিয়ে দৌড় দেবার ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন। মাথা পিছনে হেলিয়ে হাত উপরে তুলে হাঁক দিলেন, "আও--"

দু' তিনবার কাকে যেন ডাকলেন আকাশ থেকে নামতে। দু'বার তুড়ি বাজালেন। হঠাৎ খপ করে কি যেন মুঠো করে ধরলেন শূন্য থেকে। হাতের মুঠো খুলে দেখালেন সবাইকে। তাঁর দু' আঙ্গুলের মাঝখানে সেই কলম।

কলমটা পকেটে পুরে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে একটু হাসলেন। মাথা নামিয়ে 'থ্যাঙ্কু' বলে বিহ্বল লোকগুলির চোখের উপর রাস্তায় নেমে এলেন।

লোকগুলো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরের রোদে এমন বিচিত্র মানুষ এবং তাঁর যাদুর খেলা দেখার কথা তাদের স্বপ্নেও ছিল না।

১৬

হাঁটতে হাঁটতে এঙলিঙ অনেক দূর চলে গেলেন। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালেন। কপালগুণে বামাল সমেত পালিয়ে আসতে পেরেছেন। থলের ভিতর এখন সেই কুঠারের ফলক। কত হাজার বছর আগে মানুষ কুঠার তৈরী করেছিল তা এখনই বোঝা যাবে না।

কারবন পরীক্ষায় ফেললে যথাযথ সময় পাওয়া যাবে। এঙলিঙ রোমাঞ্চ অনুভব করলেন।

একদিন এই এলাকায় ছিল শালের বন। তা আন্দাজ করতে পারছেন। কত রকম জীবজন্তু ঘুরে বেড়াতো। তাদের পাশে বাস করতো কিছু মানুষ। তারা শিকার করে ক্ষুধা মেটাতো। তারপর তাদের আস্তানা হল। আস্তানা শক্ত করতে দরকার হল কাঠ। আজকের মানুষের মত হাজার রকমের ধাতু তাদের ছিল না। তখনো খনিজ ধাতু ব্যবহার করতে শেখে নি মানুষ। তাদের ভরসা পাথর। সেই পাথর ঘসে ঘসে তাদের কুঠারে পরিণত করেছে। সে কুঠার শিকার করার সঙ্গে গাছ কাটতে তাদের কাজে লেগেছে।

ধাপে ধাপে এগিয়েছে মানুষ। তাদের অভিজ্ঞতা বেড়েছে। শিখেছে তামার ব্যবহার। তামা এসে পাথরের কুঠারকে বাতিল করে দিয়েছে। চলার পথে এমনি লোহা এসে একদিন তামাকে বাতিল করে দিয়েছে। মানুষ চলার পথের পাশে পাশে কত উপাদান ফেলে এসেছে তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়।

সেই ফেলে আসা একখানি কুঠার আজ তার বংশধররা সিঁদুর লেপে পূজা করছে। ভালোবাসা, ভক্তির আড়াল দিয়ে রক্ষা করছে। কি রক্ষা করছে তা ভুলে গেছে। আপন মনে এঙলিঙ বললেন, 'বিচিত্র।'

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসেছেন তিনি। পথের নীচে লাল কাঁকর মাটি। পাশেই শালবন।

থমকে দাঁড়ালেন এঙলিঙ। অবাক চোখে দেখতে থাকলেন শালবন। সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে গাছ—একের পর এক। সোজা হয়ে উপরে উঠে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। রোদ আসছে না নীচে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বন। মাঝে মাঝে দু'একটা কাটা গাছ। পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে উইয়ের ঢিপি।

সেই আদিম পৃথিবী এখনও বেঁচে আছে। মাটির ভিতর থেকে হাজার হাজার হাত তুলে সূর্যের আলো পান করছে সবুজ পাতা মেলে। একদিন এমনি বনের মধ্যে গাছের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটতো মানুষ। খুঁজতো বেঁচে

থাকার উপাদান। শালবন নীরবে দাঁড়িয়ে দেখতো মানুষের অভিযান। কিভাবে মানুষ দল বেঁধে বাঁচতে চাইছে। নিজেকে নিরাপদ করে অভিজ্ঞতা তুলে দিয়ে যাচ্ছে বংশধরদের হাতে।

এঙলিঙ যেন সেই আদিম মানুষ হয়ে গেলেন। বন তাঁর ভিতর বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তিনি এগিয়ে চললেন শাল গাছের মধ্য দিয়ে। চমৎকার লাগছে। কাঁকর মেশানো লাল মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে শাল বন।

খানিকটা গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হ'ল এঙলিঙকে। তাঁর সামনে শালবনের মধ্যে বিরাট এক চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার মত অনেকখানি জায়গা কে যেন খুঁড়ে মাটি তুলে নিয়েছে! লাল মাটি হাঁ করে আছে। শালবন যেন সেই বড় হাঁ করা মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

ধাঁধায় পড়লেন এঙলিঙ। বনের মধ্যে চৌবাচ্চা খুঁড়লো কারা? দু'-মানুষের মত গভীর গর্ত। তিনি আরো একটু এগিয়ে গেলেন। রহস্য পরিষ্কার হল। এক জায়গায় দেখতে পেলেন আলগা লাল মাটি অর্থাৎ মাটি কেটে এনে এখানে ফেলেছে বন-দপ্তর।

শালবনের মধ্য দিয়ে বর্ষার জল গড়িয়ে নামে। যেখানে জলের ধার থাকে সেখানকার মাটি কেটে নীচে নামিয়ে নিয়ে যায়। এমনি প্রবল ধারায় জল নেমে মাটি কেটে কেটে একদিন তৈরী হয়েছিল গনগনির খোল। এখানেও বোধহয় আর-এক গনগনির খোলের সূচনা হয়েছিল। বন-দপ্তর টের পেয়ে মাটি কেটে ভরাট করে রেখেছে।

আবার বড় গর্তের কাছে ফিরে এলেন তিনি। খাড়া দেওয়াল। মাঝে মাঝে পাথরের মুখ বেরিয়ে আছে। ফুট দু'য়েক নীচের একখানা পাথরে এঙ-লিঙের চোখ আটকে গেল। তিনি বসে পাথরখানা দেখবার চেষ্টা করলেন। কিছু বুঝতে পারলেন না। উল্টো দিকে গিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে বসলেন। মাথা নীচু করে দেখতে চাইলেন পাথরখানা।

হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে ধাক্কা দিল। তিনি উল্টে পড়লেন।

নীচে পড়লেন। খুব একটা লাগলো না। কিন্তু পড়লেন কি ভাবে? উপরে কোন মানুষ দেখতে পেলেন না। শালগাছের মাথাগুলো শুধু দেখতে

পেলেন, তার মাঝখানে নীল আকাশ।

কে যেন পেছন থেকে হাল্কা হাতে ধাক্কা দিয়েছিল। এঙলিঙ মাথা নাড়লেন। নিশ্চয় কেউ ধাক্কা দিয়েছিল, নয়তো পড়তেন না। মনে হয়েছিল একখানা হাত তাঁর পিঠের উপর কেউ রেখেছিল। কিন্তু কিছু বুঝবার আগেই ধাক্কা—

এঙলিঙ চীৎকার করে উঠলেন, "হু আল ইউ।"

কোন উত্তর এল না। তাঁর চীৎকার গহ্বরের মধ্যে পাক খেয়ে তাঁকেই যেন ব্যঙ্গ করল।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। কি করবেন বুঝতে পারলেন না। তখন ফস্ করে আওয়াজ হল। চমকে উঠলেন এঙলিঙ। চারিদিকে চোখ বোলালেন, কিছু দেখতে পেলেন না। রক্তের মত লাল মাটি আর মাঝে মাঝে মুখ বের করে আছে কালো পাথর।

একটু বাদে তামাকের গন্ধ পেলেন। নাকটা উঁচু করলেন এঙলিঙ। না, কোন ভুল নেই। নাকে পোড়া তামাকের গন্ধ। গর্তের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কোন লোক সিগারেট খাচ্ছে। কিন্তু কে? তাঁকে ধাক্কা মেরে গর্তে ফেললো কেন তা বুঝতে পারলেন না।

১৭

আবার গর্তের দেওয়ালগুলো দেখলেন। দেওয়াল খাড়া। উঠে যাবার সহজ কোন রাস্তা নেই। দেওয়াল বেয়ে হয়তো ওঠা যায় কোন রকমে। কিন্তু উপরে উঠতে দু'হাতই ব্যবহার করতে হবে। পীঠের ঝোলা নিয়ে একদম ওঠা যাবে না। ঝোলা ফেলে নিজেকে মুক্ত করার কথা ভাবতেই পারলেন না। ঝোলায় আছে তাঁর কয়েক দিনের সংগ্রহ। কোনটাই সাধারণ জিনিস নয়। কতগুলি হীরের টুকরো।

উপরে নীল আকাশ আর চক্‌-চকে নীল নয়, খানিকটা বিবর্ণ। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে গেছে। শালের পাতা চক্‌-চক্‌ করছে না আর। এখানে গুমোট গরম। পায়ের নীচের মাটি নরম। সিগারেটের গন্ধ কখন মিলিয়ে গেছে। থেকে থেকে একটা ঘুঘু মন্থর গলায় ডাকছে। তার ফলে বিষণ্ণতা নেমে আসছে।

পাথরের একখানা টুকরো ভালো করে দেখতে যাওয়ার ফলেই এ বিপত্তি! এই বনের মধ্যে মানুষ হয়তো কারো পছন্দ হয় নি। সে আড়ালে আড়ালে অনুসরণ করে এসেছে। সুযোগ পেয়ে নীচে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। থাক, বুড়ো মানুষটা ঠ্যাং ভেঙ্গে গর্তে। না খেতে পেয়ে আপনি মরে যাবে।

এরা কারা? এণ্ডলিঙ ভাবতে শুরু করলেন। প্রথমেই মনে এল ডাকাতদের কথা। তাঁর কাছে ডাকাতি করার মত কিছু নেই। যে হীরে মুক্তো আছে তা ডাকাতদের কাজে লাগবে না। তিনি শুনেছেন বনের মধ্যে অনেক চোর-বদমাস আত্মগোপন করে থাকে। লুকিয়ে পশু শিকার করে চামড়া বিক্রি করে। এ বনে কোন পশু থাকার কথা নয়। অনেকে চুরি করে গাছ কাটে। তারা বনের মধ্যে মানুষ আসা পছন্দ করে না। তাই বলে একটা মানুষকে মৃত্যুর মুখে····

না, তা হতে পারে না, এণ্ডলিঙ সিদ্ধান্ত পাল্টালেন। মনে পড়লো শীলাবতী নদীর কথা। গুলি করেছিল কারা? কেন? তিনি যেন একটু আলো দেখতে পেলেন। তাঁরা এখানে অবাঞ্ছিত তা অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অবাঞ্ছিত কেন তা বুঝতে পারছেন না।

একটা খরগোশ এসে দাঁড়ালো গর্তের মুখের কাছে কান খাড়া করে। দু'বার কান নাচালো, তারপর পালিয়ে গেল। এণ্ডলিঙ বুঝলেন কাছাকাছি এখন আর কোন মানুষ নেই।

আকাশে রোদ নেই। অন্ধকার হয়ে আসছে। দুটো পাখী বেড়িয়ে গেল তীর বেগে। বাসায় ফিরে যাচ্ছে। এবার অন্ধকার নামবে। এখনই গর্ত থেকে বের হতে হবে। লুকিয়ে থাকতে হবে কোন গাছের আড়ালে। অন্ধকার হলে সরে পড়বেন।

খাঁজের দিকে এগিয়ে গেলেন। দাঁত বের করা পাথরগুলো ধরে ওঠা

যাবে কিনা তা পরীক্ষা করতে গেলেন। একখানা পাথরের টুকরোয় হাত দিতে গিয়ে লাফিয়ে সরে এলেন পাঁচ হাত দূরে।

গর্ত থেকে মাথা বের করে রেখেছে একটা সাপ। সাপের মাথাকেই লাল মাটিতে গাঁথা পাথর ভেবেছেন তিনি।

সাপটা আওয়াজ পেয়েই ফণা তুললো। লাল মাটির পটভূমিকায় তার ফণাকে মনে হল কুলোর মত। ফণা দোলালো। জিভ বের করে একবার যেন হাওয়া চেটে পরখ করলো। গলা আবার টেনে নিল ভেতরে। কেউটে সাপ।

এঙলিঙের মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। সামনেই মৃত্যু। কেউটে কি ভয়ঙ্কর সাপ তা অজানা নয়। একবার ছোবল দিলে আর রক্ষা নেই। তেমনি নিষ্ঠুর স্বভাব। গাছের পাতা নড়লেও কেউটে ছোবল হানে।

তিনি আরো সরে এলেন। বুঝলেন, গর্তের ভিতর ফেলে দিয়ে লোকটি সরে পড়েছে কেন? কেউটের যে বাসা আছে তা সে জানে। তাই ঠেলে ফেলে আর কোন খোঁজ নেয় নি।

তিনদিকের দেওয়াল দেখলেন। একেবারে খাড়া। কোন রকমেই বেয়ে ওঠা যাবে না। দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছে। কোমর পর্যন্ত অন্ধকারে ডুবে গেছে। আর একটু অন্ধকার হলেই সাপের গর্ত অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। তারপর?

গভীর ঘন অন্ধকার একটা গর্ত। গর্তের মধ্যে এঙলিঙ তাঁর সঙ্গী একটা কেউটে সাপ। সাপটা কোথায় তা আর জানা যাবে না।

এঙলিঙের মাথায় দু'এক গাছ যা চুল আছে সব খাড়া হয়ে গেছে। গলগল করে ঘামছেন তিনি। সামনে অনিবার্য মৃত্যু। ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলেন, "হেল্প মী....হেল্প মী।"—কোন সাড়া পেলেন না। শব্দ শুনে কেউটে সাপ ভয় পেয়ে আবার ফণা তুললো।

সাপ সরে যেতেই পটলমামা সুস্থির হলেন। বললেন, "খুব ভয় পেয়েছিলাম।"

সাধুজী হেসে বললেন, "ওরা কামড়ায় না। অনেকদিন ধরে আমার সঙ্গে আছে।"

পটলমামা ভুরু বাঁকা করে বললেন, "সসর্পে চ নিবাস।"

সাধুজী হাসলেন। বললেন, "এটা গড়বেতা। তাল-বেতালের রাজ্যে উল্টো-পাল্টা ব্যাপার ঘটতে পারেই। নয়তো হিন্দু মন্দিরের দরজা উত্তর দিকে হবে কেন?"

পটলমামা খানিকটা সময় মাথা নীচু করে কি যেন ভাবলেন। বললেন, "সর্বমঙ্গলা কে, কি ভাবে তাঁর জন্ম, তা জানেন?"

সাধুজী অসহায় ভঙ্গী করে বললেন, "কি করে জানবো। তেত্রিশ কোটি দেবতার জন্ম কাহিনী কি জানা সম্ভব?"

পটলমামা বললেন, "আমি একটা গল্প জানি। গল্পটা উড়িষ্যার।"

সাধুজী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রকম? বলেন শুনি।"

পটলমামা পাইপে দীর্ঘ টান লাগিয়ে বললেন, "চণ্ডীর সঙ্গে অসুরের যুদ্ধ—এইতো ইতিহাস। আপনাদের সর্বমঙ্গলা কিন্তু চণ্ডী নন, দুর্গাও নন। তবে কে এ প্রশ্ন উঠবে। উনি চণ্ডীর সহচরী মাত্র।"

পটলমামা থামলেন। দু'বার পাইপ টেনে বললেন, "চণ্ডী অসুরের সঙ্গে পারছেন না। যতবার যুদ্ধে যাচ্ছেন ততবার হেরে আসছেন। তখন তাঁর সহচরী যুদ্ধে জয়ী হবার উপায় বাৎলে দিলেন।"

সাধুজী বললেন, "কি রকম?"

পটলমামা বললেন, "সহচরী বললেন চণ্ডীকে বিবস্ত্র হয়ে যুদ্ধ করতে। চণ্ডী তাই করলেন। যুদ্ধে তাঁর জয় হল। অসুর বধ করে ফিরে এসে সহচরীকে বর দিলেন, এখন থেকে সর্বমঙ্গলা নামে তুমি পূজা পাবে।"

সাধুজী বললেন, "বিচিত্র ইতিহাস।"

পটলমামা বললেন, "আপনাদের সর্বমঙ্গলার মূর্তি ভাল করে লক্ষ্য করবেন। দেখলে মনে হবে কাঠ কেটে তৈরী। এরকম কাঠের মুখ উড়িষ্যায় পাওয়া যায়। আমি বলতে চাইছি উড়িষ্যার ছাপের কথা।"

সাধুজী গম্ভীর গলায় বললেন, "এত কথার পরেও কিন্তু রহস্য থেকেই গেল।"

পটলমামা বললেন, "রহস্য থাকলে তার সমাধানও আছে। স্থানীয় লোকদের মধ্যে প্রচলিত গল্পের মধ্যে আছে সমাধান।"

সাধুজী বললেন, "কোন্ গল্পটার কথা বলছেন? সেই যোগী পুরুষের কথা, তখন বিক্রমাদিত্য রাজা। যোগী পুরুষ বনের মধ্যে সর্বমঙ্গলার কথা শুনে আসেন। এখানেই সাধনা করেন। বিক্রমাদিত্য তাঁর নাম শুনে এখানে আসেন বেতাল-সিদ্ধ হতে।"

পটলমামা কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, "এই গল্পটির মধ্যেই আছে আসল সত্যের ঈশারা। এই যোগী পুরুষ কে? তাঁর নাম জানা যায় না। তিনি যে খুব বড় যোগী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। যোগের সঙ্গে কারা সব থেকে বেশি যুক্ত? এ প্রশ্নের জবাবে নিশ্চয় তন্ত্রের কথা আসবে। তন্ত্র সাধকরা ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী নিয়ে কারবার করে—এ হ'ল লোক-বিশ্বাস। কাপালিকরা নরবলি দেয়। আদিবাসীরা তাদের দেবীর কাছে নরবলি দিত না তা ভাববার সুযোগ নেই।"

সাধুজী বললেন, "সাঁওতাল, বাউরী এরা মুরগী, শুকর বলি দেয়।"

পটলমামা পাইপ কামড়ে ধরে বললেন, "যোগী সর্বমঙ্গলার নাম শুনে গড়বেতায় আসেন নি। এখানে ছিল অরণ্যবাসীদের বনদেবী। সেই বনদেবীর স্থানকেই তিনি নির্বাচন করেন নিজের সাধনার ক্ষেত্র রূপে। বনদেবী গাছের নীচে গ্রামের প্রান্তে বনের মধ্যে থাকেন। তার মুখ যদি উত্তর দিকে থাকে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।"

সাধুজী দ্বিধা জড়িত গলায় বললেন, "কিন্তু সর্বমঙ্গলা...."

পটলমামা তাঁকে থামালেন। বললেন, "কালে কালে পাল্টে পাল্টে আদিম মানব সমাজের বনদেবী সর্বমঙ্গলায় পরিণত হয়েছেন। রুক্মিনী,

চম্‌কিনী এ রকম কোন দেবী ছিলেন আদিতে। মূর্তির ভয়ঙ্করতা তাই বলে।"

সাধুজী আর কোন কথা বললেন না। কি বলবেন বুঝতে পারলেন না।

মায়ের নাম গান করতে করতে এলেন আর একজন। অনেক দূর থেকেই তাঁর গলা শোনা যাচ্ছিল। ভরাট গলায় গাইছিলেন :

"এমন মা কোথায় পাব, নিত্যদিন যে...."

উপরে উঠে এলেন। ভক্তি সহকারে প্রণাম করলেন মা কালীকে। সামনে এসে পটলমামাকে দেখতে পেলেন। ভুরু বাঁকা হয়ে গেল তাঁর। খানিক সময় তাকিয়ে থেকে বললেন, "আপনি ?"

পটলমামা জবাব দিলেন না। উত্তর দিলেন সাধুজী। বললেন, "আপনি চিনবেন না, নতুন লোক। বেড়াতে এসেছেন গড়বেতা।"

"অঃ"—গলায় বিচিত্র এক শব্দ করলেন আগন্তুক। বসলেন না। বললেন, "গড়বেতা কি রকম লাগছে আপনার ?"

পটলমামা সংক্ষেপে বললেন, "ভালই।"

সাধুজী পটলমামার উদাসীনতায় বোধহয় একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, "উনি কয়েক দিন থেকেই গড়বেতার সব জেনে নিয়েছেন। আমাদের সর্বমঙ্গলা দুর্গা নন, সর্বমঙ্গলাও নন।"

আগন্তুক বিস্মিত গলায় বললেন, "তাই নাকি ? আমরা কি তাহলে যুগ যুগ ধরে ভুল করে আসছি ?"

পটলমামা মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন, "ভুল করবেন কেন ? যে যাকে যেমন ভাবেন। তবে উনি কোন প্রাচীন বনদেবী। স্থানীয় আদিবাসীদের কাছে পূজো পেতেন। যে কোন কারণে হোক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

আগন্তুক আহত গলায় বললেন, "আপনি বলতে চান বাউরী, ডোম, কৈবর্ত, তাদের দেবতা ?"

পটলমামা উষ্ণ গলায় বললেন, "হ্যাঁ, তাদেরই দেবতা। আপনারা চুরি করে তাঁকে দুর্গা, সর্বমঙ্গলা এসব রূপে সাজিয়েছেন। যাদের দেবী তারা মন্দির চাতালে এখন আর আসতেও পারে না। দূরে দাঁড়িয়ে

দেখে। অর্থ আর ক্ষমতায় ওরা তো পরাজিত।"

পটলমামার চোখা-চোখা শব্দ শুনে আগন্তুক একটু ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, "আপনি এসব কথা বলছেন বটে তবে কোন প্রমাণ নেই।"

পটলমামা বললেন, "প্রমাণ?" তিনি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন তা বুঝতে পারলেন। ঘন ঘন পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে একগাদা ধোঁয়া উগড়ে দিয়ে বললেন, "প্রমাণ আছে। ঐ মন্দিরের চাতাল এক সময় ছিল বন জঙ্গলে ঢাকা। তান্ত্রিকরা সারা রাত আগুন জ্বেলে সাধনা করতো। দু'চারজন কাপালিকও আস্তানা গেড়েছে। দস্তুর মত নরবলি হত। হয়তো নরবলির আতঙ্ক থেকেই অনেক দূরে নাম ছড়িয়েছে।"

পটলমামা একটু দম নিলেন যেন। দম নিয়ে বললেন, "এখানকার লোকরা একসময় বৌদ্ধ ছিল। বাংলার দরিদ্র আর আদিবাসীরাই বেশির ভাগ বৌদ্ধ মত মেনে চলতো। বৌদ্ধ ধর্মের পঞ্চশীল তাদের জীবনযাত্রা আর বিশ্বাসের অনুকূল। পরে ব্রাহ্মণরা এসে জোরজার করে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে।"

আগন্তুক থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর দাঁড়িয়ে থাকা উদ্ধত ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারা গেল পটলমামার কথা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।

পটলমামা পা মাটিতে ঠুকলেন। বললেন, "আমার কথা বিশ্বাস করা আপনাদের পক্ষে কঠিন, কিন্তু বাস্তব ঘটনা তাই। মন্দিরের বাইরে দুটি বড় পাথরের মূর্তি আছে নিশ্চয় দেখেছেন।"

সাধুজী বললেন, "হ্যাঁ, দেখেছি, ভৈরব মূর্তি।"

পটলমামা বললেন, "দুটি মূর্তিই বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি। অনেক প্রাচীন মূর্তি বলে খয়ে খয়ে ওরকম হয়ে গেছে। ওতো মাটির ভিতর থেকে আপনারা পেয়েছেন।"

আগন্তুক বিস্মিত গলায় বললেন, "হ্যাঁ, মাটির ভিতর থেকেই পাওয়া গেছে। আপনি জানলেন কি করে?"

পটলমামা আগন্তুকের প্রশ্নের জবাব দিলেন না। বললেন, "মন্দিরের

ভিতরটা সুরঙ্গের মত। দেখে কামাখ্যা মন্দিরের কথা মনে হয়। সর্বমঙ্গলার পাশেই আছে পঞ্চমুণ্ডির আসন। সর্বমঙ্গলা তন্ত্রের কোন এক ভয়ঙ্কর দেবী। তার ফলেই বেতালের গল্প জন্ম নিয়েছে। সর্বমঙ্গলার দাঁতের পাটি দেখলেই তাঁর আসল ভয়ঙ্কর আদিম রূপের আঁচ করা যাবে।"

পটলমামা থামলেন। অন্য দু'জনেও কোন কথা বললেন না। পটলমামার পাইপের তামাক ফুরিয়ে গিয়েছিল। তিনি পাইপে তামাক পুরলেন। তামাক পুরে পাইপ ধরালেন। পাইপ ধরিয়ে বললেন, "আমার কথাগুলো একটু বিচিত্র মনে হচ্ছে, না?"

আগন্তুক ভদ্রলোক দ্বিধা জড়িত গলায় বললেন, "কোন প্রমাণ নেই।"

পটলমামা এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "প্রমাণ-প্রমাণ"। হাতটা তুলে আগন্তুকের চোখের সামনে নাড়লেন। হাত নেড়ে বললেন, "প্রমাণ চাইছেন? আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এখান থেকে একশ ফুট দূরে দেখিয়ে দেবো প্রমাণ। আপনারা, ব্রাহ্মণরা এখানে যখন আসেন নি, বাগড়ীর রাজ পরিবার গড়বেতায় রাজধানী করেন নি, তখনো মানুষ বাস করতো। আপনারা যাদের অন্ত্যজ করে রেখেছেন, ছোটলোক বলেন, তারা এখানে বাস করতো।"

যেমন হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছিলেন তেমনি বসলেন ঝপ্ করে। বসে বললেন, "আইন-ই-আকবরীতে উড়িষ্যার রাজা যে গড়বেতা দখল করেছিল তা লেখা আছে।"

কথা শেষ করে পাইপ টানতে লাগলেন। পটলমামাকে উত্তেজিত মনে হল। তিনি কয়েকবার জোরে জোরে পাইপ টানলেন। এক রাশি ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "রাজরাজরাদের গল্প থাক, তাদের নিয়ে মাথা ব্যথা নেই আমার। আমি দেখাতে পারি গড়বেতায় আদিম অধিবাসীদের ইতিহাস। থরে থরে সাজানো আছে। প্রমাণ চেয়েছেন, প্রমাণ দেবো। কিন্তু ভেবে খারাপ লাগছে, আপনারা আসল খবর না রেখে তাল-বেতালের গল্প বলেন। দুর্ভাগ্য মশাই যে আপনি জানেন না একটা মানব গোষ্ঠীর কবরের উপর দাঁড়িয়ে আছেন।"

আগন্তুক চমকে পাঁচ হাত দূরে সরে গেলেন।

এঙলিঙ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। কি করবেন বুঝতে পারছেন না। দর দর করে ঘামছেন। কেউটে সাপ মাথা বের করে তেমনি দোল খাচ্ছে। অন্ধকার নেমে আসছে দ্রুত। একটু পরেই কালি-গোলা অন্ধকারে ঢাকা পড়বে গর্ত। কেউটে সাপ তখন কি করবে বোঝা যাচ্ছে না।

একবার ভাবলেন, কাঁধের থলেটা দিয়ে সপাটে মারেন ফণার উপর। যদি হাত কেঁপে যায়? মাথাটা যদি না থেত্‌লায়? সুরুৎ করে কেউটে নেমে আসবে মাটিতে। তারপর অন্ধকারের মধ্যে একটা ক্রুদ্ধ কেউটে আর তিনি।

তবু ঝোলাটাকে পিঠ থেকে টেনে নামালেন। হাতে থাকলে ঢালের মত করে ধরে হয়তো সাপের ছোবল এড়িয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু তা কতক্ষণ! এঙলিঙ নড়তে এখন ভয় পাচ্ছেন। অন্ধকারের মধ্যে নড়তে দেখে সাপটা ফোঁস করে নেমে আসার সম্ভাবনা আছে। ধীরে ধীরে নীচু হতে থাকলেন। তিল তিল করে নিজেকে নীচু করছেন। হাত নীচে নামছে। এক সময় হাতের থলে মাটির নাগাল পেল। থলে নামালেন।

একটুও না নড়ে ধীরে ধীরে সোজা হলেন। পকেট থেকে দিয়াশলাই সাবধানে বের করলেন। হাতে দিয়াশলাই থাকলো, অন্তত আলো জ্বেলে একটু সময় অন্ধকার দূর করতে পারবেন।

পায়ের কাছে ঠাণ্ডা লাগলো। সাপটা নেমে এল নাকি? ভয় পেয়ে এঙলিঙ ফস্ করে কাঠি জ্বালালেন। অন্ধকার গিয়ে আলো ঝল্‌সে উঠলো। তখন সাপটাকে দেখতে পেলেন। আলো দেখে ঘাবড়ে গিয়ে একটু একটু করে মাথা ভিতর দিকে ঢুকিয়ে নিচ্ছে সাপটা।

এঙলিঙ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এতক্ষণে একটা কৌশল বের করতে পেরেছেন। হয়তো গর্তের ভিতর সাপটাকে আটকে ফেলতে পারবেন।

তা করতেই হবে। নয়তো বাঁচার কোন উপায় নেই।

ফস্ করে আবার কাঠি জ্বালালেন। সাপ আর একটু ভিতরে ঢুকে গেল। আবার জ্বালালেন। সাপ মাথা আরো ঢুকিয়ে নিল। পকেটের মধ্যে কাগজ আছে মনে এল।

একখানা কাগজ টেনে বের করে কাঠির উপর ধরলেন। চোখ সাপের গর্তে। কাগজে আগুন লাগলো না। কাগজ আগুনের ছোঁয়া পায় নি।

কাঠি নিভে যেতেই আবার অন্ধকার। ফস্ করে আবার কাঠি জ্বালালেন। না, সাপ বেরিয়ে আসে নি। এবার কাঁপা কাঁপা হাতে কাগজ ধরলেন। কাগজ জ্বলে উঠলো। গর্ত কাগজের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠলো। সাপ ভয় পেয়ে আরো ভিতরে ঢুকলো।

সরু একখানা পাথর দেখতে পেলেন এগুলিঙ। লাল মাটির মধ্যে থেকে দাঁত বের করে আছে।

ধরে টান দিতেই একটু মাটি ঝরে পড়লো, পাথর খসলো না। সর্বশক্তি দিয়ে আবার টান দিলেন। এবারে পাথরখানা আল্‌গা হয়ে উঠে এল।

পাথরের টুকরোটি নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন। মুহূর্তে গর্তের মুখে ঠেসে গুঁজে দিলেন। তারপর পাগলের মত তাকে চাপতে লাগলেন।

পাথরখানা ভিতরে ঢুকলো।

আবার কাগজ জ্বালালেন। আর একখানা পাথর খুলে সেখানাও ঠেশে ঢুকিয়ে দিলেন। নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলেন না। আর একখানা পাথর খসাতে গেলেন। পাথরখানা খসাতে পারলেন না। উত্তেজনায় তাঁর বুক হাঁপরের মত ফুঁসছে। কপাল বেয়ে ঘাম নামছে। হাত পা কাঁপছে। পাথর খসছে না। এগুলিঙ এত জোরে টান দিলেন যে হঠাৎ পাথরখানা বেরিয়ে এল।

তিনি ছিটকে পড়লেন দূরে। মাথায় লাগলো। অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

চোখ খুলে তাকালেন। সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে বসে আছেন কেন বুঝতে পারলেন না। মাথা ভারী। চেতনা শিথিল। উপরে চোখ গেল। অন্ধকারের মধ্যে মাথার উপর চুম্‌কী লাগানো কালো চাঁদোয়া। কে টানালো?

ধীরে ধীরে সব মনে পড়লো। গর্তের মুখে বসে গর্তের গা দেখা। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়া। অমনি তীরের ফলার মত মনে এল সাপের কথা। চোখের উপর যেন দেখতে পেলেন সাপটিকে। বিশাল ফণা তুলে দুলছে। মাথার উপর খড়মের ছাপ। বিষধর কাল কেউটে। জিভ বের করে হাওয়া চেটে যেন এঙলিঙকে বুঝে নিতে চাইছে।

বুকের মধ্যে যেন কে ছুরি বসিয়ে দিল। আকণ্ঠ-তৃষ্ণা। ভয় এসে সাঁড়াশীর মত গলা চেপে ধরেছে। চীৎকার করে উঠলেন, "হেল্প মী···· হেল্প মী····"

আর চীৎকার করতে হোল না। তার আগেই এক ঝলক আলো গর্তের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়েছে। এঙলিঙের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। উপরে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। উপর থেকে গর্তে আলো ফেলছে।

এঙলিঙ বললেন, "হেল্‌প্‌ মী।"

উপর থেকে আওয়াজ এল, "সিওর।" তার পরেই অন্ধকার। আলো নিভিয়ে দিয়েছে। এঙলিঙ উপরের সামান্য আলোতে এবার দেখতে পেলেন তাদের। চার-চারটি যুবক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাথার উপর আকাশ। আকাশে তারা।

অন্ধকার দেখে আবার সাপের কথা মনে এল তাঁর। চীৎকার করে উঠলেন, "প্লীজ হেল্‌প মী। থেনেক্‌, এ বিগ থেনেক্‌, কাল কেউতে····"

আবার তারা টর্চ জ্বাললো। আলো ঝাপিয়ে পড়লো গর্তের মধ্যে। সাপটাকে দেখা গেল না। গর্তের মুখে পাথরখানা আটকে আছে। স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেললেন এঙলিঙ। এতক্ষণে স্বাভাবিক হতে পারলেন তিনি।

একটা গাছের ডাল নেমে এল গর্তের ভিতর। মাঝে মাঝে তার গাট। দেখতে এক কাঠি সিঁড়ির মত। আলো ফেলে জিজ্ঞাসা করলো, "উঠতে পারবেন ?"

তিনি ভালো করে সিঁড়ি দেখলেন। বললেন, "থিওল-থিওল।"

নীচু হয়ে ঝোলা তুলে নিলেন পিঠের উপর। ডাল আঁকড়ে লাল মাটির দেওয়ালে পা রেখে রেখে উঠতে লাগলেন।

আলো নিভলো না। আলো জ্বেলে রেখে সাহায্য করতে লাগলো তারা।

উপরে উঠতেই একজন খপ করে চেপে ধরলো তাঁর হাত। চাপা গলায় বললো, "পেয়েছি।"

তিনি প্রতিবাদ করলেন না। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

কঠিন গলায় একজন বললো, "সোজা হাঁটবেন। কোন রকম "ফিকির করবার চেষ্টা করবেন না। গুলি করে মাথার চাঁদী উড়িয়ে দেবো।" পিস্তলটা একেবারে কপালের উপর চেপে ধরলো।

একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ কপাল বেয়ে বুকে নেমে এল। ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠলেন এঙলিঙ। এক ঝম্‌কায় হৃদপিণ্ডের রক্ত থমকে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলো। তিনি কথা বললেন না, হাঁটতে শুরু করলেন।

এঙলিঙ হাঁটছেন। তাঁর সামনে একজন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ছ'পাশে ছ'জন। পিছনে একজন। তার হাতে উদ্ধত পিস্তল, না দেখেও তিনি বুঝতে পারলেন।

শালবনের মধ্যে ডানে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছুলেন একটা কাঁটা ঝোপের পাশে। তার ছ' পাশে ছটো উইয়ের ঢিপি। এত বড় উইয়ের ঢিপি এঙলিঙ কখনো দেখেন নি। পাহাড়ের চূড়ো সাজিয়ে দাঁড়িয়ে জায়গাটাকে শালবন থেকে যেন বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

ঢিপির মাঝখানে এসে এঙলিঙের সবার আগে মনে এল সাপের কথা। এইসব উইয়ের ঢিপির মধ্যে বাস করে কেউটে সাপ। আবার সেই সাপের আস্তানায়! ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "থেনেক্!"

চারজনের কেউ জবাব দিল না। একজন ফস্‌ করে দিয়াশলাই

জ্বালালো। একখানা মোম জ্বেলে বসিয়ে দিল। এঙলিঙ দেখতে পেলেন আর একজনকে। একপাশে মাটির উপর বসে আছে। চোয়াল শক্ত। মাথায় রুমাল বাঁধা। নাকের নীচে নকল গোঁফ। হাতের কাছে একটা পিস্তল। আলো লেগে চক্ চক্ করছে।

লোকটির গায় ঘিয়ে রংয়ের পাঞ্জাবী। বোতাম খোলা। দেখা যাচ্ছে গড়ানো-পেটানো বুকের অংশ। প্রথমে সে-ই কথা বললো। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলো, "হু আর ইউ ?"

চট্ করে প্রশ্নের জবাব দিলেন না, দিতে পারলেন না। এ রকম বিচিত্র পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন তা কখনো ভাবেন নি। কি জবাব দেবেন তা আগে থেকে ভেবে নেওয়া দরকার। সামান্যতম ভুলে একটা সিসের গুলি এসে মাথায় গেঁথে যেতে পারে। আর উঠতে হবে না। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে এই শালবনে। মানুষ তাঁর মৃত দেহের খোঁজ না পেলেও শকুন পাবে। শেষ পর্যন্ত শকুনের খাদ্য হতে হবে ?

যুবকটি অসহিষ্ণু হল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললো, "আপনি কে ?"

আর একটি যুবক বিরক্তির সঙ্গে বললো, "আজ চার-পাঁচ দিন ধরে দেখছি শুধু ঘুর-ঘুর করছেন। গড়বেতায় ঘুর-ঘুর করার কি আছে ?"

এঙলিঙ চোখ তুলে যুবকটিকে দেখলেন। নাকের নীচে সদ্য গজিয়ে ওঠা গোঁফ। লম্বা চুল। কালো প্যাণ্ট আর বুক খোলা হাফকলার সার্ট গায়ে চাপিয়েছে। চোখের তারা জ্বল জ্বল করছে। তীব্র এক আলো জ্বলছে সেখানে। মানুষ যখন সব কিছু গুঁড়িয়ে নিজের মত করে নিতে চায় তখন এরকম আলো চোখে জ্বলে তা তিনি জানেন।

বসে থাকা যুবকটি আবার প্রশ্ন করলো, "আপনি কে ?"

তিনি মাথায় ঝাকুনি দিলেন। হাতখানি বুকের উপর এনে নিজেকে দেখিয়ে বললেন, "এঙলিঙ। এ ওল্দ, আই মিন্ ওল্দ ম্যান।"

তাঁর মুখে উচ্চারণের দোষে ওল্ড ম্যান যে ওল্দ হয়ে গেল তা তারা বুঝতে পারলো না। বিরক্ত হয়ে খেঁকিয়ে উঠলো, "হোয়াট ?"

এঙলিঙ চমকে উঠে তার মুখ দেখলেন। মুখখানা পাথরের মত শক্ত।

চোখে উদাসীন দৃষ্টি। হলে হবে কি, তার বসা, কথা বলার মধ্যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসজাত শক্তি আছে। 'হোয়াট' শব্দের সঙ্গে সেই শক্তি আত্মপ্রকাশ করে যেন এঙলিঙের বুকের মধ্যে ছুরির মত গেঁথে গেল।

তিনি ঘাবড়ালেন না। বললেন, "এঙলিঙ মাই নেম। তিবেথিয়ান ফিলথফাল। দর্থন—আই মিন—দর্থন—ধর্ম।..."

তিবেথিয়ান যে টিবেটিয়ান হবে তারা বুঝতে পারলো। তিনি যে তিব্বতের এক দার্শনিক তা মানতে পারলো না। কাটা কাটা গলায় বললো, "সত্য পরিচয় বলুন। নয়তো বিপদ হবে।"

তিনি এক ঝট্‌কায় মাথা ঘুরিয়ে বললেন, "থত্য। হান্‌দ্রেদ পারথেনত থ্‌ত। এঙলিঙ। হেল্‌পাল। পথলমামা। মাই মাত্‌থাল।"

একজন বিস্মিত গলায় বললো, "পথলমামা?"

তিনি ঘাড় দুলিয়ে সুরেলা গলায় বললেন, "ইয়েত-ইয়েত। গ্রেত্‌ পথলমামা। ইউ নো পথলমামা?"

পাঞ্জাবী-গায়ে যুবকটি একটু চটে গেল। বললো, "স্টপ ইট। পথল-পটল উই ডোন্‌ট ওয়ান্‌ট।"

"নো-নো..." এঙলিঙ মাথা নাড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। "পথলমামা, এ গ্রেত ম্যান। গ্রেত আর্কলজিথ। ইউ নো হিম, গ্রেত পথল-মামা? থ্যামথুন্দল..." উত্তেজনা ও আবেগে তিনি হাত নাড়াতে থাকলেন।

কালো জামা গায়ে যুবকটি বিরক্তির সঙ্গে বললো, "ডোণ্ট টক এ লাই।"

"নো-নো" আবার সরবে প্রতিবাদ জানালেন এঙলিঙ। বললেন, "ইউ নো পথলমামা। গ্রেত আর্কলজিথ। থ্যামথুন্দল চকোল..."

যুবকটি বাধা দিয়ে বললো, "আর্ক-ফার্ক বন্ধ করুন। চালাকী ছেড়ে সত্য কথায় আসুন। নয়তো দেখছেন!" হাতের পিস্তল তাঁর চোখের সামনে ধরলো।

তিনি বড় বড় চোখ করে পিস্তল দেখলেন। উষ্ণ গলায় বললেন, "পিথ্‌তল-পিথ্‌তল। নাথিং। ও দিয়ে কিত্‌থু হোবে না। উই ওয়ান্‌ত হিথ্‌তরী।"

যুবকটি ব্যঙ্গের স্বরে বললো, "এ দিয়ে চাঁদী ওড়ানো যায়। বিপ্লব করা যায়। হিষ্‌ট্রী দিয়ে হয় কচু।"

এঙলিঙ চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, "বিপ্লব! ভেলী গয়েদ। দেত্‌ বড়লায়। রেদিখ্যাল চেইন্‌জ। বাত্‌ হোয়াত্‌? কি চাও ম্যান? নতুন থমাজ? নতুন থমাজ তৈরী হয় হিথ্‌ট্রী জেনে। ইউ নো বেঙ্গল হিথ্‌ট্রী? হোয়াত্‌ ইউ ওয়ান্ত? ইউ নো নাথিং।" বুড়ো আঙুল তুলে নাচালেন তিনি।

তাঁর কাণ্ডকারখানা, অকুতোভয় দেখে তারা স্তব্ধ হয়ে গেল।

২১

পাঞ্জাবী গায়ে যুবকটি আবার সিগারেট ধরালো। তার চোখ এঙলিঙের মুখে। মানুষটিকে বুঝে নিতে চাইছে। সত্যি তিনি দার্শনিক না পুলিশের গুপ্তচর তা বুঝে নিতে হবে। দেশের ইতিহাস না জেনে দেশের পরিবর্তন আনা যায় না এটা ঠিক কথা। তাদের নিজেদের ইতিহাস জ্ঞান কম তা ঠিক। বাংলার ইতিহাস ভালো করে না পড়েই তারা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছে। সে বিপ্লব হয়তো শেষ হবে বা বিপ্লব চলবে। বিপ্লব হলে তারপর? এত বড় কথা একজন গুপ্তচরের মুখ থেকে শোনা যাবে ভাবে নি।

এঙলিঙ পকেট থেকে কলম বের করলেন। হাত উল্টে তার উপরে কলমটি শুইয়ে ঘুরিয়ে দিলেন। কলম হাতের উল্টো পিঠে ঘুরতে থাকলো। তিনি বললেন, "ইউ থি—ইউ থি।" হাতের পাশে অন্য হাতখানা উল্টে রাখলেন। কলম ঘুরতে ঘুরতে পাশের হাতে এল।

আবার তিনি বললেন, "ইউ থি—ইউ থি" তাঁর হাতের উল্টো পীঠে তেমনি কলম ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে ডান হাত থেকে বাঁ হাতে যাচ্ছে। বাঁ হাত থেকে ডান হাতে আসছে।

কালো জামা গায়ে যুবকটি কর্কশ গলায় চীৎকার করে উঠলো, "স্টপ

ইট। আমরা ম্যাজিক দেখতে চাই না।"

ঘাবড়ে তিনি কলম ঘোরানো বন্ধ করে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

যুবকটি খেঁকিয়ে উঠলো আবার, "ইউ সি।" পিস্তল হাতে ঘুরিয়ে বললো, "টিকটিকিদের আমরা জ্যান্ত মাটি চাপা দি।"

এঙলিঙ চোখ নাচিয়ে বললেন, "ইউ মিন খোচো?"

যুবকটি কোন জবাব দিল না।

তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "নো নো—হামি খোচো নই। এ ফিলথফাল। ইউ নো পথলমামা...."

তাঁর কথা শেষ হল না। ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল যুবকটি। বললো, "আলতু-ফালতু কথা শোনার সময় নেই। বলুন কি কি জানতে পেরেছেন।"

তিনি কোন কথার জবাব দিলেন না।

যুবকটি রূঢ় গলায় বললো, "স্পিক্ অন। চুপচাপ বসে থেকে কোন লাভ নেই।"

এঙলিঙ চিবুকের শেষ প্রান্তে ঝুলে থাকা চুল ক'গাছা কাঁপানো বন্ধ করে বললেন, "ইয়েত-ইয়েত। আই নো ঘলবেতা। মিথিরিয়াত্ হিথ্তরিক্যাল প্লেথ। ইউ নো নর্দার্ন ব্লাক পলিত্ড ওয়্যাল? গুপ্ত? শুঙ্গ? নো-নো।"

তিনি নিজের মনে খানিক সময় মাথা ঝাঁকালেন। মাথা ঝাঁকুনি থামিয়ে বললেন, "নিউলিথিক স্পত্ ঘলবেতা। ইউ নো নিউলিথিক...."

আবার যুবকটি ধমক দিল, "স্টপ, নিউলিথিক, কচু, ঘণ্টা...."

তিনি তীব্র গলায় প্রতিবাদ জানালেন, "নো, নো...."

পাঞ্জাবী গায়ে যুবকটি নীরবে ধুমপান করছিল। সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে যুবকটির দিকে তাকালো। বললো, "কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ওর থলে সার্চ কর।"

একজন যুবক থলেটিকে টেনে আনতে গেল।

তিনি আর্ত গলায় চীৎকার করে উঠলেন, "নো—নো....।" থলে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরলেন।

যুবকটি ছাড়লো না। সে ধরে টানতে থাকলো। হলে কি হবে এঙলিঙের কাছ থেকে থলে ছাড়িয়ে আনতে পারলো না। তিনি সর্বশক্তি

দিয়ে থলে আঁকড়ে আছেন আর চীৎকার করছেন, "নো—নো····"

একজন যুবক পিছন দিক থেকে তাঁকে চেপে চিৎ করে মাটিতে ফেলে দিল। এক ঝট্‌কায় থলে তাঁর হাতছাড়া হল।

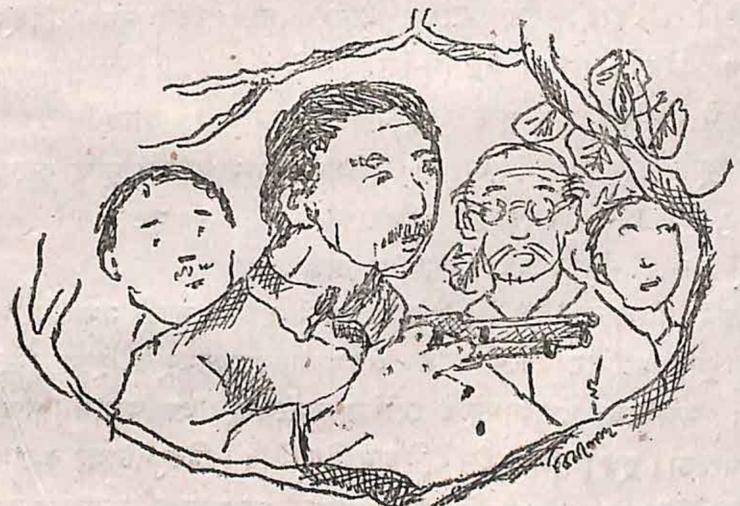
যুবকটি থলের মুখ খুলতে গেল। এণ্ডলিঙ উঠে বসলেন। দেখলেন যুবকটি থলের মুখ খুলছে। পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন। পারলেন না। অন্য যুবকটি তার আগেই তাঁকে জাপটে ধরলো।

থলের মুখ খোলা হল। মোমবাতির আলোতে থলে উল্টে দিতেই ঝন্‌-ঝন্ করে থলের ভিতরের সব কিছু মাটির উপর পড়লো।

থলে থেকে মাটিতে পড়লো একগাদা খোলামকুচি! হাড়ি-কলসীর টুক-রোর একটা ছোটখাট পাহাড় হয়ে গেল। এত খোলামকুচি দেখে যুবক ক'য়টি বিহ্বল হয়ে পড়লো। একটা মানুষের যত্ন সহকারে বয়ে বেড়ানো একটা থলের মধ্যে থাকবে কতগুলো ভাঙা খোলামকুচি, তা তারা স্বপ্নেও ভাবে নি।

বিহ্বলতা কাটতে একটি যুবক বললো, "পাগল।" এণ্ডলিঙকে সে জাপটে ধরে রেখেছিল। তার বাহু বন্ধন আপনা থেকে শিথিল হয়ে গেল।

তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "ম্যাদ ম্যান? পাঘল? নো-নো।"



"ইউ সি····টিকটিকিদের আমরা জাস্ত মাটি চাপা দি।"

বসে থাকা যুবকটি সখেদে বললো, "ফালতু ঝামেলায় একটা দিন নষ্ট হল।"

অন্য আর একজন ক্ষিপ্ত গলায় বললো, "ঝন্টুটার মাথায় গোবর। একটা পাগল নিয়ে এত কাণ্ড।"

পাগল বলতেই তিনি চটে গেলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নেড়ে প্রতিবাদ জানাতে বললেন, "নো-নো—নত্ পাঘল। হিথ্তিরিয়ান-হিথ্তিরিয়ান। ফেইনদ অফ পথলমামা, ইউ নো পথলমামা? গ্রেত্ হিথ্তিরিয়ান, ইউ নো হিম?"

কালো জামা গায়ে যুবকটি হতাশ হয়ে নিজের চুল মুঠো করে ধরলো। হতাশ গলায় বললো, "একটা পাগল খোলামকুচি কুড়োচ্ছে গড়বেতায়। আমি আর ঝন্টু গাধা তার পিছনে চার দিন লেগে আছি। আমি একটা গাধা।" হতাশায় ক্ষোভে তার গলা বুজে এল।

পাঞ্জাবী গায়ে যুবকটি বললো, "এই বিচার বুদ্ধি নিয়ে তোমরা বিপ্লব করবে? শোষিত মানুষদের মুক্ত করা এত সোজা!"

ঝন্টু ক্ষোভের সঙ্গে মাথা ঝাঁকালো। একটা আঙুল তুলে এওলিস্তকে দেখিয়ে বললো, "পাগল, বদ্ধ উন্মাদ।"

তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "নো, নো, পাঘল নয়। মিথ্তার এওলিস্ত। হিথ্তিরিয়ান। ইউ থি-ইউ থি...."

তিনি ক্ষিপ্তের মত ছুটে এলেন খোলামকুচির কাছে। একখানা খোলামকুচি টেনে তুললেন হাতে। দু'আঙুলের মাঝখানে তুলে ধরলেন। বললেন, "ইউ থি—" দাঁড়িয়ে রইলেন একজন যাদুকরের মত।

যুবক কয়টি নীরবে দেখতে লাগলো তাঁর কাণ্ড।

তিনি বললেন, "ইউ থি, N.B.P., নর্দার্ন ব্লাক পতালী ফম্ বিহার।" খোলামকুচি নামিয়ে রেখে আর একখানা খোলামকুচি তুলে নিলেন হাতে। সবাইকে খোলামকুচি দেখিয়ে বললেন, "গ্রে কলাল পত্তালী ফম ঘলবেতা। সুঙ্গ পিলিয়দ ইন ইন্দিয়ান হিথ্তিরি। দিত্ পটালী কলাল।"

"ইউ থি" বলে খোলামকুচিটি নিয়ে পাঞ্জাবী গায়ে যুবকটির নাকের কাছে ধরলেন। তাকে দেখিয়ে এক লাফে এলেন কালো জামা গায়ে যুবকটির

কাছে। বললেন, "ইউ থি।" তার দেখা হতেই আর একজনের নাকের ডগায় ধরলেন। সবাইকে দেখিয়ে সাবধানে নামিয়ে রাখলেন মাটিতে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত নাড়িয়ে বললেন, "দীথু, আই মিন দীথু। দীথুল জন্ম? নো, নো, ফাইভ্ হান্‌ড্রেদ ইয়ার্ত্ অ্যাঘো অন ঘলবেতা—ম্যান। মান্থত্—ঘর-বালি—" এঙলিঙ আবার খোলামকুচি হাতে তুলে নিলেন।

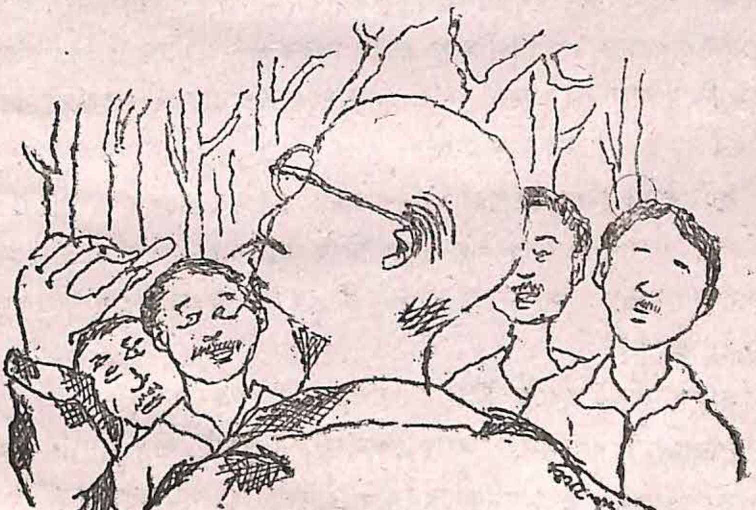
পাঞ্জাবী গায়ে যুবকটির শক্ত চোয়াল শিথিল হয়ে গেল। বললো, "যীশু-খৃষ্টের জন্মের পাঁচ শত বৎসর আগে মানুষ বাস করতো গড়বেতায়?"

তিনি দীর্ঘ সুরেলা গলায় বললেন, "ইয়েত-ইয়েত। থ্রুত্ অন্ মাই হ্যান্দ।" খোলামকুচি আবার তিনি নাড়িয়ে দেখালেন।

যুবকটি বললো, "আপনি বসুন মিঃ এঙলিঙ। আমাদের ভুল হয়েছে। আমরা অভদ্র আচরণের জন্য দুঃখিত।"

এঙলিঙ একগাল হেসে আলোর সামনে বসে পড়লেন।

যুবকটি সখেদে বললো, "আমরা দেশকে ভালবাসি অথচ দেশের কোন খবর রাখি না—এ বড় লজ্জার।"



....ইয়েত-ইয়েত। থ্রুত অন মাই হ্যান্দ।

২২

পটলমামা বললেন, "দেশের ইতিহাস আবিষ্কার করা খুব সহজ কাজ নয়। শ্রম, নিষ্ঠা, জ্ঞান, অনুশীলন, ভালোবাসা এমনি অনেক গুণ চাই।"

আগন্তুক বুঝতে পারলেন না পটলমামার কথা। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন।

পটলমামা বললেন, "শীলাবতী, কংশাবতী, রূপনারায়ণ এসব নদীর পারে লুকিয়ে আছে ভারতের ইতিহাসের অনেক অজানা কাহিনী। কে বলতে পারে সভ্যতার সূচনা বাংলা ভূখণ্ডেই হয় নি?"

পটলমামা প্রশ্ন করে থামলেন। দু'জনার মুখ দেখলেন। সাধুজী চুপ-চাপ বসে আছেন। অবশ্য চোখ মুখ তাঁর স্ফীত হয়ে উঠেছে। নিজের ভিতর উত্তেজনা অনুভব করছেন। কিন্তু কিছু জানেন না বলে চুপচাপ বসে আছেন। অন্যজন বাক্যহারা। পাইপ মুখে একটা মানুষ এত অতীতে তাঁদের দু'জনকে টেনে নিয়ে যাবে তা ভাবেন নি। অন্যদিকে সভ্যতার এই রহস্যময় কাহিনী তাঁদের কাছে অভিনব মনে হচ্ছে।

পটলমামা নিস্পৃহভাবে খানিক সময় পাইপ টানলেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "তাল-বেতালের গল্প-গুজব নিয়ে আপনারা মশগুল হয়ে আছেন গড়বেতার মানুষ। আপনারা জানেন কি যে বাস করছেন সুঙ্গ যুগের একটা সমাধির উপর?"

সাধুজী একটু চমকে উঠলেন। বললেন, "বলছেন কি?"

পটলমামা বললেন, "আমি খোলামকুচি কুড়াই বলে আপনি গতকাল ব্যঙ্গ করেছিলেন। খোলামকুচির কি পরিচয় তা আপনি জানেন?"

সাধুজী বললেন, "গরীব মানুষরা মাটির হাড়ি-কলসী ব্যবহার করে। ভেঙ্গে গেলে ফেলে দেয়। তার আবার মূল্য কি থাকবে?"

পটলমামা মুখ থেকে পাইপ নামালেন। তিনি চটে গেলেন, তা বোঝা

গেল মুখ দেখে। বললেন, "হ্যাঁ মশাই, যাদের গরীব করে রেখেছেন তারা মাটির হাড়ি-কুড়ি ব্যবহার করে। কিন্তু যখন লোহা, পিতল, কাঁসা ছিল না তখন মানুষ এসব কাজ কি দিয়ে করতো ?"

সাধুজী বিড় বিড় করে বললেন, "তামা। গরীব যারা তারা মাটির।"

পটলমামা পাইপ মুখে তুলে ধরে বললেন, "প্রথমে মানুষ কাঁচা মাটির বাসন তৈরী করে রোদে শুকিয়ে কাজে লাগাতো। তারপর তাকে পুড়িয়ে শক্ত করতে শিখলো। চিন্তা করুন কতখানি সুখ-স্বস্তি তারা তখন পেল।"

আগন্তুক ভদ্রলোক এবার মুখ খুললেন। বললেন, "মানুষ অনেক অসুবিধা থেকে রেহাই পেল।"

পটলমামা আঙুল তুলে বললেন, "দ্যাট্স্ রাইট্। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন এলাকায় নানা রকমের খোলামকুচি পাওয়া গেছে। লাল কালো খোলামকুচি। এগুলো খৃষ্ট জন্মের পাঁচ শত বছর আগের। তার পরেই চক্চকে কালো। সংক্ষেপে বলা হয় N.B.P.। আপনি যে কবরের উপর বসে আছেন সেখানে আছে ধূসর কালো রংয়ের খোলামকুচি। বাউরী পাড়ায় চক্চকে কালো খোলামকুচি পেয়েছি। আর একরকম পাত্র হত বালি মেশানো মাটিতে, তা পেয়েছি।"

সাধুজী বললেন, "কি বলছেন ? এতো ধারণাই করতে পারছি না।"

পটলমামা মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে হাসলেন। বললেন, "কবরের উপর যারা ঘর বানায় তারা কি কবরের খবর রাখে ?"

দু'জনে নীরব রইলেন, মুখে কোন ভাষা এল না।

২৩

পাঞ্জাবী গায়ে যুবকটি বললো, "মিঃ এঙলিঙ, আপনার ক্ষিদে পাওয়ার কথা। দুপুর থেকে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে আছেন। কিছু খাবেন ?"

তিনি চোখ কাঁপিয়ে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "ইয়েত্-ইয়েত্।"

একটি যুবক উঠে গেল। উই ঢিপির এক পাশে জড় করা শালপাতা সরিয়ে দিল। হাত বাড়িয়ে ছোট গর্ত থেকে টেনে বের করে আনলো একটা প্লাস্টিকের থলে। থলের মধ্যে মুড়ি আর বাতাসা।

যুবকটি প্রথমেই এঙলিঙকে মুড়ি বাতাসা দিয়ে নিজেদের জন্য রেখে থলে আবার ঢিপির গর্তে পুরে দিল। কেটলি বের করে এনে একটা লোহার মাথায় তাকে ঝুলিয়ে দিল। অপর একটি যুবক তার নীচে শুকনো কাঠে আগুন জ্বেলে দিল।

জঙ্গলের মধ্যে এমন নিখুঁত আয়োজন দেখে এঙলিঙ বিস্ময় মানলেন। বুঝতে পারলেন, এ হল যুবকদের দুর্গ। জঙ্গলে ঘাঁটি করে তারা সশস্ত্র এক বিপ্লবের ছক তৈরী করেছে। এরা দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু দেশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না নিয়েই তারা বিপ্লবের পথে পা দিয়েছে।

পরিণতি কি হবে তা তিনি কল্পনা করতে পারছেন। বিয়োগান্ত এক নাটক অভিনয় হবে বুঝতে পেরে বেদনায় বুক ভরে গেল। গনগনির খোলের কথা মনে এল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ঘাঁটি ছিল গনগনির খোল। দিনের পর দিন তীর, ধনুক, টাঙ্গী নিয়ে ইংরেজদের মুখোমুখি হয়ে লড়াই করেছে। সেই বীরত্বময় আত্মত্যাগের কোনো কাহিনী কোনো লেখক লেখেন নি। লিখে রাখলে কত বীরপুরুষ আর আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিকের জীবন কাহিনী

জানা যেত।

মুড়ি শেষ হতেই এঙলিঙকে তারা চা দিল। তিনি চা মুখে দিলেন। দুধ-চিনিহীন চা। তবু তাঁর ভালো লাগলো। গনগনির খোলের সেই আত্মত্যাগীরা হারিয়ে যায় নি। আবার বেঁচে উঠেছে নতুন চেহারায়। যতদিন মানুষকে মানুষ শোষণ করবে ততদিন এরা জন্ম নেবে। ভুল করবে। হারিয়ে যাবে। তবুও তারা আসবে।

এঙলিঙ চোখের সামনে যেন যুবক ক'টির মৃত দেহ দেখতে পেলেন। গনগনির লাল কাঁকড়ের উপর রক্ত ঢেলে দিয়ে শুয়ে আছে। মন তাঁর দুঃখে, বেদনায় কানায় কানায় ভরে গেল। একটা অন্ধকার গর্ত, গর্তের মধ্যে কেউটে সাপ, মাথায় পিস্তলের হিমশীতল স্পর্শ—সব ভুলে গেলেন।

চা শেষ হতেই পাঞ্জাবী গায়ে যুবকটি বললো, "চলুন, আপনাকে বনের বাইরে পৌঁছে দি। আমাদের কথা কিন্তু কাউকে বলবেন না।"

তিনি কোন জবাব দিতে পারলেন না।

কালো জামা গায়ে যুবকটি খোলামকুচিগুলো যত্ন সহকারে থলের ভিতর পুরে দিল। তার খোলামকুচি থলেতে তোলার মধ্যে ফুটে উঠলো অসীম মমতার ছাপ। এসব খোলামকুচি একদিন হাড়ি-কুড়ি হয়ে গৃহস্থের ঘরে ব্যবহার হত। তারাই-তো পিতা-পিতামহের দল।

এঙলিঙ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন।

২৪

সারারাত পটলমামা দু' চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। থেকে থেকে এঙলিঙের কথা মনে এল। প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা যেন কেউটে সাপ হয়ে তাঁর গা বেয়ে উঠে আসছিল।

ভোর হতেই উঠে পড়লেন। সাধুজী আর তাঁর সঙ্গীকে ডেকে তুললেন। সাধুজী চা তৈরী করে দিলেন। চা খেয়ে পটলমামা বললেন, "আমাকে

এখনই যেতে হবে। বন্ধুটিকে খুঁজতে হবে।"

সাধুজী চিন্তিত ভাবে বললেন, "রাত পার হয়ে গেল, ভদ্রলোক ফিরলেন না। সত্যি খোঁজ নেওয়া দরকার।"

পটলমামা পাইপ ধরিয়ে বললেন, "চলুন, আপনাদের দেখাবো আপনাদের পিতা-পিতামহদের কবর। তাঁরা মরে গেছেন কিন্তু রেখে গেছেন তাঁদের জীবন যাত্রার পরিচয়।"

তিনজনে ইটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন বাইরে। বাইরে এসে পটলমামা শীলাবতী নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালেন। খাড়া পাড়। নদী মাটি খেয়ে খেয়ে দেওয়ালের মত করে তুলেছে। ঢিপির উপর সাধুজীর ঘর। চারিপাশে ঢিপির উপর সাধুজীর পোতা গাছ। কোন কোন গাছের শিকড় নীচের দিকে মাটি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

তিনজনে নদীর খাড়া পাড় ধরে এগোলেন। কয়েক পা এগিয়ে পটলমামা থমকে দাঁড়ালেন। নদী থেকে সাত-আট ফুট উপরে মাটির মধ্য দিয়ে মুখ বের করে আছে হাড়ি-কলসীর ভাঙা টুকরো। একের পর এক। মনে হয় কে যেন সারি দিয়ে খোলামকুচি গেঁথে রেখেছে। খোলামকুচির উপর ফুট ছয়েক পাথর, মাটি আর লাল কাঁকর। কাঁকরের উপর একটা খেজুর গাছ গজিয়ে উঠেছে।

পটলমামা বললেন, "দুষ্টু বালকের কীর্তি। খোলামকুচি মাটিতে গেঁথে রেখেছে।"

সাধুজীর সঙ্গী বললেন, "না, না, তা কি করে হবে?"

পটলমামা তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "তবে কিভাবে ওগুলো ওখানে গেল?"

লোকটি মাথা চুলকে বললো, "খোলামকুচি মাটির উপর থাকার কথা।"

সাধুজী বললেন, "তাই ছিল। তারপর তার উপরে মাটি জমেছে। মাটি জমার ফলে খোলামকুচি নীচে এসেছে।"

পটলমামা বললেন, "ছাট্‌স রাইট্। কিন্তু ছ'ফুট মাটি জমতে কত শত বছর লাগে?"

সাধুজী বললেন, "শত শত বছর কেন, দু'আড়াই হাজার বছর লেগে

যেতে পারে।"

পটলমামা বললেন, "এবার আপনারা নিজেরা পড়ুন গড়বেতার অতীত ইতিহাস। খোলামকুচির ভাষায় আপনাদের পিতা-পিতামহেরা লিখে রেখে গেছেন।"

দু'জনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পটলমামা বললেন, "আপনারা আপনাদের ইতিহাস পড়ুন। আমি চলি।"

পা ফেলবার আগেই শুনতে পেলেন, "গয়েদ মর্নিং, গয়েদ মর্নিং...."

পটলমামা ঘুরে দাঁড়ালেন। এঙলিঙকে দেখতে পেলেন নদীর ওপারে। নদীর বালিতে নেমে হাত তুলে গুড মর্নিং জানাচ্ছেন। তাঁর পিছনে লাল সূর্য।

———